বার্ষিক সাময়িকী

প্রবাল

চৌত্রিশতম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৯

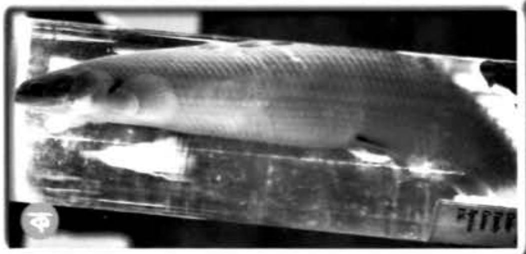

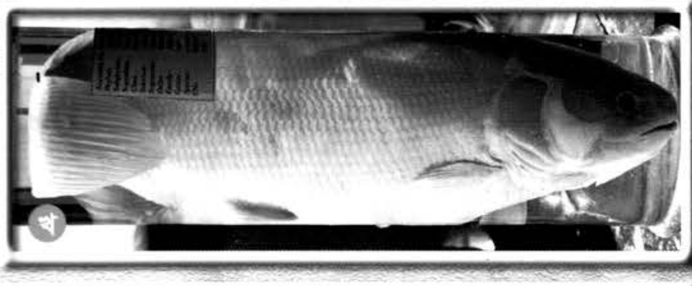

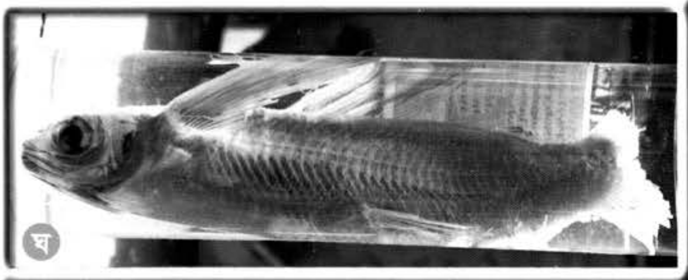

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাণিবিদ্যা সমিতি

প্রবাল

বার্ষিক সাময়িকী

৩৪তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৯

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম

সম্পাদক

প্রফেসর ড. সাবিনা সুলতানা

সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. মো. আরিফুল হাসান

প্রফেসর ড. সারমিন আক্তার

ড. মনিকৃষ্ণ মহন্ত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. সাবিনা সুলতানা, সম্পাদক, প্রবাল

ফটোগ্রাফি

ড. মো. ফজলুল হক

প্রকাশ: নভেম্বর, ২০২০।

প্রচ্ছদ: বিভাগীয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কয়েকটি দূর্লভ প্রজাতির মাছ (সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা ৫৪ পৃষ্ঠায়)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাণিবিদ্যা সমিতি

© রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিজাইন ও মুদ্রণে: ইকরা প্রিন্টিং প্রেস, কাজলা, রাজশাহী ৬২০৪, সেলফোন: ০১৭১৪-৩৩৪৩৮৮।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতির নানাবিধ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবি।

বার্ষিক সাময়িকী

প্রবাল

চৌত্রিশতম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৯

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	-বিভাগীয় সভাপতি	১
সম্পাদকীয়	-সম্পাদক, প্রবাল	২
মরহুম প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীনের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত		৩-৪
মরহুম প্রফেসর মোশাররফ হোসেনের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত		৫-৬
মানুষের বিপাকীয় রোগ-ব্যাধি	-প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম	৭-১৭
ইস্টার আইল্যান্ডের দূর্ভাগ্য	-মো. সাজ্জাদুর রহমান শাওন	১৮-১৯
Bioluminescence in the living world	-মো. বাদশা আলম	২০-২৫
প্রফেসর ড. কে. এন. শাহজাহান করিমের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত		২৬
বাংলাদেশে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস	-বায়তুন নাহার মৌরী	২৭
মগজখেকো অ্যামিবা	-প্রফেসর ড. সারমিন আক্তার	২৮-২৯
রদবদল প্রকৃতিতে এবং আগামীর দিনগুলো	- ফারহীন তামান্না তিথী	৩০
রহস্যময়ী বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল	-ফয়সাল রাহাত	৩১-৩৫
বিষাক্ত পাখি হুডেড পিটোহুই	-আল-আমিন তুহিন	৩৬
সল্যু ব্যাগ: প্লাস্টিকের বিকল্প এক উদ্ভাবণা	-কানিজ বিনতে জামান	৩৭-৩৮
প্রাণী বিষয়ক কবিতাযুগল	-মোসা. মাসরুফা জিন্নাত ও মোসা. সুমাইয়া পারভীন	৩৯
তৃণভোজী হস্তী পাখি	- ফয়সাল রাহাত	৪০
পৃথিবীর আয়না	-আসলাম খান রকি	৪১-৪২
রহস্যময় জীব ব্লব	-মোসা. মাসরুফা জিন্নাত	৪২
ডেঙ্গু জ্বর	-মো. ফিরোজ সরকার	৪৩-৪৪
বিভাগের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সমাচার	-প্রফেসর ড. মো. আনিছুর রহমান	৪৪
নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ: কোভিড-১৯	-ড. মো. ফজলুল হক	৪৫-৫১
বিভাগীয় মিউজিয়াম: দর্শনার্থীদের চোখে	-ড. আনজুমান আরা আলী	৫২-৫৪
প্রাণিবিদ্যা বিভাগে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ		৫৫-৫৭
প্রাণিবিদ্যা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ		৫৮
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতির কার্যকরী পরিষদ		৫৯
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতির কার্যবিবরণী	- মো. তাহাজ্জত হোসেন জীবন	৬০
প্রাণিবিদ্যায় ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের পরিচিতি		৬১-৬৩
পৃথিবীর কয়েকটি অদ্ভুদ ও দুষ্প্রাপ্য প্রাণী		৬৪

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ৬২০৫।
টেলিফোন: (০৭২১) ৭১১১১৯
ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
ই-মেইল : zoology@ru.ac.bd
Website : http://www.ru.ac.bd/zoology/

মুখবন্ধ

প্রবাল প্রকাশনায় এবার অনাকাঙ্খিত বিলম্ব স্পষ্টতঃ কোভিড-১৯জনিত। গত বছরে (২০১৯) গঠিত *প্রবাল* ৩৪তম সংখ্যার সম্পাদনা পরিষদ শুরু থেকেই লেখা সংগ্রহ ও সম্পাদনার উদ্যোগ নেয়। বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের লেখা প্রবন্ধ, প্রাণী ও প্রকৃতি বিষয়ক তথ্য-কণিকা, কবিতা ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতির বার্ষিক কার্যক্রম, অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি, নবীন বরণ, বিদায় অনুষ্ঠান এবং শিক্ষাসফরের মত প্রতিবেদনগুলো এই বার্ষিক সাময়িকীতে স্থান ও গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বলতে দ্বীধা নেই, প্রবাল-এর জন্য লেখা সংগ্রহ, নির্বাচন ও সম্পাদনা বরাবরই একটি কঠিন ও শ্রমনির্ভর কাজ। তা ছাড়া, প্রেসে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব প্রায়ই লক্ষ করা যায়। ফলে *প্রবাল* প্রায়শঃই যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এবারের সংখ্যায় বেশিরভাগ লেখাই জ্যেষ্ঠ তথা বিএস-সি চতুর্থ বর্ষ (সম্মান) ও এমএস শ্রেণির শিক্ষার্থীদের। তাই, তাদের লেখার বিষয় চয়ন, বৈচিত্র্য ও পরিপক্কতা লক্ষণীয়। কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার বিষয়বস্তুসম্বলিত তথ্যাদি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও উৎসাহিত করে বিধায় এবারেও তা' যুক্ত করা হলো। বছরের শুরুতেই দু'জন কৃতিমান শিক্ষকের আকষ্মিক মৃত্যুতে বিভাগ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে; তাঁদের স্মরণে সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং *প্রবাল* সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের নানাবিধ সহযোগিতা ছাড়া বার্ষিক সাময়িকীটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখা কষ্টসাধ্য ও প্রায় অসম্ভব বিধায় আমি তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে সমিতির বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পাদক মো. ফিরোজ সরকারের কর্ম তৎপরতা ছিল প্রশংসনীয়। পরিশেষে, *প্রবাল*-এর আগামী সংখ্যাগুলো আরও তথ্য-সমৃদ্ধ, আকর্ষণীয় ও যথাসময়ে প্রকাশিত হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম
সভাপতি
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদকীয়

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, প্রবালের ৩৪তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এই প্রকাশনার মাধ্যমে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় দু'জন শিক্ষাগুরু প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন এবং প্রফেসর ড. মো. মোশাররফ হোসেন এর বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করছি। বিভাগের লেখাপড়া, গবেষণা ও সময়ের গন্ডীবদ্ধ জীবনের মাঝে থেকেও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক লেখার মাধ্যমে তাদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ করেছে প্রবালে। শিক্ষার্থীদের লেখার পাশাপাশি কয়েকজন শিক্ষকের জ্ঞানগর্ভ বিষয়ভিত্তিক লেখা এই প্রবালকে সমৃদ্ধ করেছে। যাদের লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি তারা যেন কলম চর্চায় অনীহা না দেখায় এই কামনা রইলো। প্রবালের এই সংখ্যা প্রকাশনা কাজে বিভাগের সকল শিক্ষক ও সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্য নিরলস শ্রম দিয়েছেন, যা প্রশংসার দাবী রাখে। সকল ভুলক্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার অনুরোধ রইলো। প্রবালের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক -এ কামনা আমাদের সকলের।

প্রফেসর ড. সাবিনা সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

মরহুম প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীনের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

ব্যক্তিগত তথ্যাদি

নাম	:	সেলিনা পারভীন।
পিতা	:	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মো. শওকত আলী; ঢাকাস্থ পিলখানা অয়্যারলেস শাখায় দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে গ্রেফতারকৃত ও ২৯ এপ্রিল পৈশাচিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ।
মাতা	:	অধ্যাপিকা ফিরোজা বেগম।
জন্ম	:	২৩-১১-১৯৫৫, রাজশাহী শহর।
স্বামী	:	মো. লুৎফর রহমান, প্রকৌশলী; পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত) পি অ্যান্ড ডি, রাবি।
পুত্র	:	ডা. মো. তৌফিক-উর-রহমান (সুপিন), বর্তমানে বাংলাদেশ দূতাবাস, সিঙ্গাপুরে কর্মরত।
কন্যা	:	জিসান-ই-গিতি (মণিমালা), প্রকৌশলী ও রুয়েটের শিক্ষক, বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি	:	পিএন গার্লস স্কুল, রাজশাহী (১৯৭০)।
এইচএসসি	:	রাজশাহী কলেজ (১৯৭২)।
বিএস-সি (সম্মান)	:	প্রাণিবিদ্যা বিভাগ (চতুর্থ ব্যাচ), রাবি (১৯৭৫)।
এমএস-সি	:	প্রাণিবিদ্যা বিভাগ (ফিশারীজ শাখা), রাবি (১৯৭৬)।
এমফিল (ফিশারীজ)	:	প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি (১৯৮৩)।
পিএইচ.ডি (কীটতত্ত্ব)	:	ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তিতে নিউক্যাসেল আপন-টাইন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য (১৯৯৩-৯৬)।
পোস্টডক্টোরাল ফেলো	:	কমনওয়েল্থ স্টাফ ফেলোশিপ, নিউক্যাসেল আপন-টাইন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য (২৫-০৯-২০০৬ থেকে ০৭-০৪-২০০৭)।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ফেলোশীপঃ নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় ওমাহা ও ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্রঃ US State Department-এর আমন্ত্রণে ‘Women in University Administration Program’-এ দু’সপ্তাহের সফর (১৬ জুন-৯ জুলাই, ২০১৬)।

কর্ম জীবন

প্রভাষক	:	প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি (০১-০৩-১৯৮৩)।
সহকারী অধ্যাপক	:	প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি (২৪-১০-১৯৮৪)।
সহকারী অধ্যাপক	:	প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি (২২-০৬-১৯৯২)।
অধ্যাপক	:	প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি (৩০-০৮-১৯৯৭)।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষকতা:

বায়োইনফর্মেটিক্স, প্রাণী আচরণ ও এথিক্স, মৎস্য বায়োলজি ও অর্থনীতি; গুদামজাত শস্যের কীট প্রতিরোধ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, পাখির প্রজাতি বৈচিত্র্য, বাস্তুসংস্থান ও আচরণ অধ্যয়ন।

সিনেটর, রাবি	: ২০০৪-২০০৮।
সিন্ডিকেট সদস্য, রাবি	: ২০১৪-২০১৬।
হাউজ টিউটর	: বেগম রোকেয়া হল।
প্রাধ্যক্ষ	: মুন্নুজান হল; ২৭-০৪-১৯৯২ থেকে ৩ বছর।
সভাপতি (প্রেষণে)	: ফিশারীজ বিভাগ, রাবি (০৫-০৯-২০০০ থেকে ১২-০৭-২০০২)।
খন্ডকালীন সদস্য	: কমনওয়েল্থ বৃত্তি বোর্ড ও নিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (২০১৫-১৭)।
হজ্জব্রত পালন	: ২৫-০৮-২০১৫ থেকে ০৩-১০-২০১৫।
সভাপতি	: প্রাণিবিদ্যা, রাবি (১৪-০৫-২০১৫ থেকে ১৩-০৫-২০১৮)।
সভাপতি	: রাবি যৌন নিপিড়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি (২০১৬-২০১৮)।

থিসিস তত্বাবধায়ন : ৩০টি এমএস-সি/এমএস, ১টি এমফিল ও ২০টি পিএইচডি।

গবেষণা ও প্রকাশনা : বেশ কয়েকটি রাবি ও বিমক গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ১৬৫টি; পাঠ্য পুস্তক (৪টি), বাংলায় জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা ১০-১২টি।

সমিতির ফেলো/সদস্য/জীবন সদস্য

ফেলো	: বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, ঢাকা।
জীবন সদস্য	: বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি, ঢাকা।
জীবন সদস্য	: রয়াল সোসাইটি ফর প্রোটেকশন অব বার্ডস, যুক্তরাজ্য।
জীবন সদস্য	: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।
জীবন সদস্য	: বাংলাদেশ এন্টোমোলজিক্যাল সোসাইটি।
সদস্য	: বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স।
অ্যালামনাই জীবন সদস্য	: রাবি প্রাণিবিদ্যা বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন।
অ্যালামনাই সদস্য	: নিউক্যাসল আপন-টাইন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।
অ্যালামনাই সদস্য	: নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়, ওমাহা, যুক্তরাষ্ট্র।
অ্যালামনাই সদস্য	: ব্রিটিশ কাউন্সিল ও কমনওয়েলথ কাউন্সিল, যুক্তরাজ্য।

আর্থ-সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা

: রাজশাহী লাওনেস্ ক্লাব, নবাবগঞ্জ অন্ধ কল্যাণ সোসাইটি, ক্যান্সার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র ট্রাস্ট, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ হার্ট ফাউন্ডেশন।

মৃত্যু : ০৪-০২-২০২০ তারিখ রাজশাহীর কাজীহাটাস্থ নিজ বাসভবন 'মায়া নীড়'-এ।

অনুলিখন : প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম; সহযোগিতায় ডা. মো. তৌফিক-উর-রহমান (সুপিন) ও প্রফেসর ড. শাহ্ হোসাইন আহমদ মেহ্দী।

মরহুম প্রফেসর ড. মো. মোশাররফ হোসেনের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাণিবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. মো. মোশাররফ হোসেন, পিতা - মৃত কাজেম উদ্দীন প্রামানিক, মাতা - ছারেজান বেগম, ১৯৭৫ সালের ২৯ অক্টোবর নাটোর জেলার লালপুর থানার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মোশাররফ হোসেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে চকনাজিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর এবং নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী থেকে যথাক্রমে এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ সালে বি.এস-সি. (সম্মান) ও ১৯৯৬ সালে এম.এস-সি. (কীটতত্ত্ব শাখা), উভয় পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী অর্জন করেন। তিনি এম.এস-সি. শ্রেণীতে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও গবেষক মরহুম প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান খানের তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ করেন।

মোশাররফ হোসেন জুন ১৯৯৯ থেকে মে ২০০০ পর্যন্ত প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন এবং জুন ২০০০ থেকে অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত *প্রশিকা* নামক এনজিও-তে Apiary Farm Manager হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি ২০০২ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ২০০৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর সহকারী অধ্যাপক ও ১৬ মার্চ ২০১০ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ৩১ মার্চ ২০১৫ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং সর্বশেষ জুলাই ২০১৯ সালে প্রফেসর গ্রেড-২ প্রাপ্ত হন।

প্রফেসর হোসেন Korean Research Foundation Grant (KRF), South Korea-র অধীন ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত Chonnam National University-র অন্তর্ভুক্ত Aqualife Medicine বিভাগের Professor Myung-Joo Oh-এর তত্ত্বাবধানে Fish Viral Disease বিষয়ের উপর গবেষণা করে ২০০৯ সালে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি ২০১৭ সালের Chinese Academy of Science (CAS) President's International Fellowship Initiative (PIFI) ফেলোশিপের অধীনে Visiting Scientist হিসেবে Chinese Academy of Sciences কর্তৃক এক বছরের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে মার্চ ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত Kunming Institute of Zoology-তে সফলভাবে গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেন। ইতিপূর্বে তিনি ২ মাসের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে নভেম্বর ২০১৫ থেকে জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত Laboratory of Herpetological Diversity and Evolution, Kunming Institute of Zoology-তে গবেষণা কাজ করেন। প্রফেসর হোসেন বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, কোরিয়া, চীন, জাপান ও ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অল্প সময়েই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। সর্বশেষ তিনি ১৭-২১ জুন ২০১৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত 10^{th} International Seminar on Apterygota-তে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রফেসর মোশাররফ হোসেন প্রধান প্রকল্প পরিচালক হিসেবে Collembolan diversity, Isolation and characterization of pathogenic bacteria from the cultured fish, DNA Barcoding and Phyllogenetics of Amphibians এবং সহ-প্রকল্প পরিচালক হিসেবে Stored Products Pest Management ও Bird Conservation

গবেষণা প্রকল্পে কাজ করেন। প্রফেসর হোসেন মৃত্যুর পূর্বে এম.এসসি/এম.এস পর্যায়ে ৭টি এবং ১টি পিএইচ.ডি. গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ সম্পন্ন করেন এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে ৪০টিরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি সহ-লেখক হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রখ্যাত মাৎস্য বিজ্ঞানী ও গবেষক প্রফেসর ড. এম. আলতাফ হোসেন ও প্রফেসর ড. মো. আব্দুল মান্নানসহ অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে "Animal Spermatozoa and Environmental Pollution-1" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এছাড়াও প্রফেসর মোশাররফ হোসেন একক ও যৌথ নামে প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান খান-এর সঙ্গে দু'টি গবেষণা অভিসন্দর্ভ জার্মানির LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

প্রফেসর হেসেন Zoological Society of Bangladesh, Bangladesh Entomological Society, Asiatic Society of Bangladesh সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের জীবন ও সাধারণ সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন গবেষণা সাময়িকী প্রকাশনার Editorial Board-এর সদস্য এবং Reviewer হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষাদান ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি ২০০৩-২০০৬ সাল পর্যন্ত মাদার বখ্‌শ হলের হাউস টিউটর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরী থেকে নির্বাচিত হয়ে এপ্রিল ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০১৪ সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষা জীবনে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য প্রফেসর হোসেন প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি, এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড স্কলারশিপ এবং বি.এস-সি. (সম্মান) পরীক্ষার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপ লাভ করেন। এছাড়া এম.এস-সি.-এর ফলাফলের জন্য নবাব আব্দুল লতিফ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।

প্রফেসর ড. মো. মোশাররফ হোসেন গত ১২ মার্চ ২০২০ সকাল ১০.৩০টায় আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর অকাল মৃত্যুতে দেশ তথা প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় একজন তরুণ ও উদীয়মান সফল শিক্ষক এবং নিবেদিতপ্রাণ গবেষককে হারিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে একটি অপূরণীয় ক্ষতি। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সহধর্মিনী (মিলিনা সুলতানা), কলেজে অধ্যয়নরত কন্যা (মাসুমা তাবাস্‌সুম মৌমি) ও স্কুলে অধ্যয়নরত পুত্র (মুনতাসির হোসেন মাউম) সহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী ছাত্র-শিক্ষক-সহকর্মী রেখে গেছেন।

অনুলিখন: প্রফেসর ড. মো. সাইফুল ইসলাম ফারুকী; সহযোগিতায় মিসেস মিলিনা সুলতানা।

মানুষের বিপাকীয় রোগ-ব্যাধি

প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম

মানুষের যত ধরনের অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে বিপাকীয় রোগ-ব্যাধি (metabolic disorders)। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আমাদের শরীরের প্রায় ৩০,০০০ রোগ-ব্যাধির মধ্যে ৪৩ শতাংশই হলো বিপাকীয় (সারণি ১), যেগুলোকে কার্যকারিতার দিক থেকে সাধারণভাবে একক-জিনজনিত (single-gene) ও বহুজিনজনিত (polygenic or multifactorial) -এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। নিচে আমরা এগুলো সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করবো।

সারণি ১. মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি

রোগ-ব্যাধির ধরন*	শতকরা হার (%)
একক-জিন	৩০
বহুজিন	১৩
ক্রোমোজমীয়	১১
অন্যান্য জেনেটিক	১৯
ফিনোটাইপিক	১৫
অ-জেনেটিক	৭
অজ্ঞাত কারণ	৫
মোট	১০০

* উৎস: উইকিপিডিয়া, ২০১৯।

একক-জিনজনিত রোগ-ব্যাধি (Single-gene disorders)

এ ধরনের একটি রোগ অ্যালক্যাপ্টোনুরিয়া (Alkaptonuria), যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'কালো প্রস্রাব' (black urine)। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলফ্রেড গ্যারড (Sir Alfred E. Garrod) সর্বপ্রথম ১৯০২ সালে এটি বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ ফলাফল নামকরা মেডিক্যাল জার্নাল *Lancet*-এ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি ১৯০৯ সালে *Inborn Errors of Metabolism* শীর্ষক একটি বইয়ে তিনি একক-জিনঘটিত রোগ-ব্যাধি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই রোগ-ব্যাধিগুলো মানুষের শুধু একটি মাত্র জিনের 'ত্রুটি' বা defect-এর কারণে প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষের একক-জিন রোগ-ব্যাধির শ্রেণিবিন্যাসসহ কয়েকটি উদাহরণ নিচের সারণি ২-এ দেখানো হয়েছে। এবার আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য একক-জিনজনিত রোগ-ব্যাধির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানবো।

সারণি ২. মানুষের একক-জিনজনিত রোগ-ব্যাধির শ্রেণিবিন্যাসসহ কয়েকটি উদাহরণ

অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাকীয় সমস্যাজনিত রোগ-ব্যাধি	ফিনাইলকিটোনুরিয়া, অ্যালক্যাপ্টোনুরিয়া, শ্বেত বা ধলারোগ, গয়টার বা গলগন্ড ইত্যাদি।
শ্বেতসারের বিপাকীয় সমস্যাজনিত রোগ-ব্যাধি	গ্যালাক্টোসিমিয়া, বংশগত ফ্রুক্টোজ অসহণীয়তা, পমপি'জ রোগ ইত্যাদি।
চর্বি বা স্নেহের বিপাকীয় সমস্যাজনিত রোগ-ব্যাধি	টে-স্যাক'স রোগ, হান্টার সিনড্রোম, হার্লার সিনড্রোম, গশার রোগ ইত্যাদি।
পিউরিন/পাইরিমিডিন বিপাকীয় সমস্যাজনিত রোগ-ব্যাধি	লেশ-নাইহান সিনড্রোম, বংশগত অরোটিক অ্যাসিডুরিয়া ইত্যাদি।
স্টেরয়েডের বিপাকীয় সমস্যাজনিত রোগ-ব্যাধি	অ্যান্ড্রোজেন অসহণীয়তা সিনড্রোম।
তামা বা কপারের বিপাকীয় সমস্যাজনিত রোগ-ব্যাধি	উইলসন রোগ।

১. ফিনাইলকিটোনুরিয়া (Phenylketonuria, PKU)

ফিনাইলকিটোনুরিয়া (সংক্ষেপে PKU) একটি অটোজোমাল প্রচ্ছন্ন অসুখ (autosomal recessive disorder), যার ফলে নবজাতকের শরীর একটি অত্যাবশকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ফিনাইলঅ্যালানিন (phenylalanine) হজম বা বিপাক করতে ব্যর্থ হয়। ফলে অ্যাসিডটি মূত্রযোগে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এ রোগের জন্য দায়ী জিনটি মানুষের ১২তম ক্রোমোজোমে অবস্থিত। ত্রুটিযুক্ত জিন *phenylalanine hydroxylase* নামক উৎসেচকটি উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ফিনাইলঅ্যালানিন অ্যামিনো অ্যাসিডটি টাইরোসিন (tyrosine) নামক অন্য একটি অত্যাবশকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় না। এই

রোগের প্রধান কয়েকটি লক্ষণের মধ্যে মানসিক অবসাদগ্রস্থতা (mental retardation), পায়ের গোড়ালি ও পায়ের পাতার দূর্বলতা, ফর্সা গায়ের রং, সোনালী চুল (blonde hair), নীল চোখ, খিঁচুনি (convulsions) ও মৃগী-ব্যারাম (epilepsy) অন্যতম (চিত্র ১)।

চিত্র ১. ফিনাইলকিটোনুরিয়ায় আক্রান্ত দু'টি শিশু।

২. গ্যালাক্টোসিমিয়া (Galactosaemia)

নবজাতকের শরীরে ত্রুটিপূর্ণ জিন থাকায় *galactose-1-phosphate uridyl transferase* এনজাইমের ঘাটতিজনিত কারণে এই রোগটি প্রকাশ পায়। এনজাইমটি উৎপন্ন না হওয়ায় রোগী খাবারের গ্যাল্যাক্টোজ (একটি খাদ্য চিনি) বিপাক বা হজম করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে শিশুটি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বমি করে, জন্ডিসে আক্রান্ত হয়, ভীষণভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং তার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়। সময়মত চিকিৎসা না করালে শিশুটির মানসিক অবসাদগ্রস্থতা, চক্ষুশুল (cataract) এবং যকৃতের সিরোসিস হতে পারে।

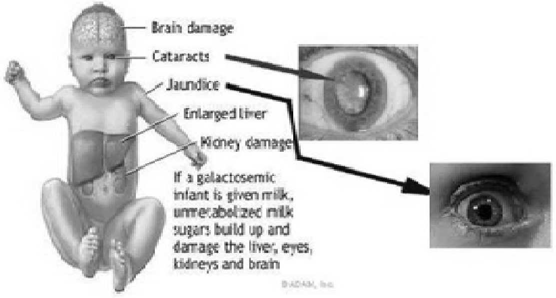

চিত্র ২. গ্যালাক্টোসিমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর কিছু বৈশিষ্ট্য।

৩. টে-স্যাক্স রোগ (Tay-Sachs' disease)

ব্রিটিশ চক্ষু বিশেষজ্ঞ ওয়ারেন টে (Warren Tay) এবং আমেরিকান স্নায়ুবিদ বার্নার্ড স্যাক্স (Bernard Sachs)-এর নামানুসারে সদ্যপ্রসুত শিশুর এই রোগটি *hexasaminidase*-A এনজাইম ঘাটতিজনিত কারণে হয়ে থাকে। খাবারে অনিহা কিংবা কম খাদ্য গ্রহণ, দূর্বলতা, শরীর ফোলা, ক্রমশ বধিরতা ও দৃষ্টিস্বল্পতা কিংবা অন্ধত্য, খিঁচুনি ও মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলো সহজে শনাক্ত করা যায়। শ্বাসনালীর সংক্রমণের কারণে রোগী সাধারণত জন্মের তিন বছরের মধ্যে মারা যায়। সাধারণ জনগোষ্ঠির তুলনায় (প্রতি ৫০,০০০ শিশু জন্মে ১টি) ইহুদি জনগোষ্ঠিতে (প্রতি ৬,০০০-এ ১টি) টে-স্যাক'স রোগের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়।

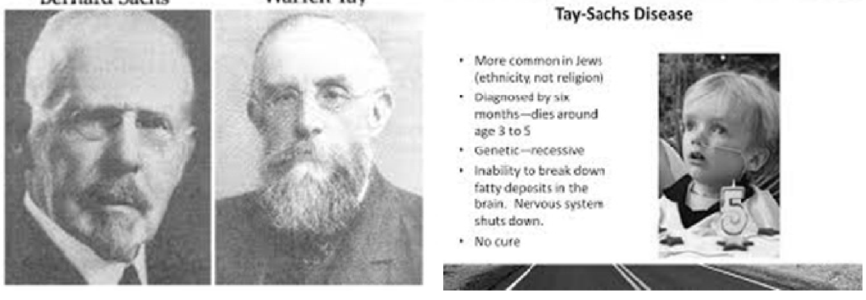

চিত্র ৩. টে-স্যাক্স রোগের আবিস্কারক বিজ্ঞানীদ্বয় এবং এই রোগে আক্রান্ত শিশু।

৪. লেশ-নাইহান সিনড্রোম (Lesch-Nyhan syndrome)

এই রোগটি একটি X ক্রোমোজোম-শৃঙ্খলিত (X-linked) প্রচ্ছন্ন জিনঘটিত ত্রুটির ফলে সৃষ্ট। আক্রান্ত নবজাতকে *hypoxanthine-guanine-phosphoriboxyl transferase* এনজাইমটির ঘাটতি রয়েছে বিধায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (CNS) অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড জমা হয়। ফলে শিশুটির অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া এবং খিঁচুনিসহ মানসিক অবসাদগ্রস্থতা লক্ষ্য করা যায়। শরীরের অংশবিশেষ যেমন হাত, আঙ্গুল, নাক, গাল, ঠোঁট ইত্যাদি অবধারিত স্ব-বিকৃতিসাধন (compulsive self-mutilation) এই রোগের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকায় গড়ে প্রতি ৩,৮০,০০০ শিশু জন্মে ১টি লেশ-নাইহান সিনড্রোমসম্পন্ন শিশু জন্মাতে দেখা যায়।

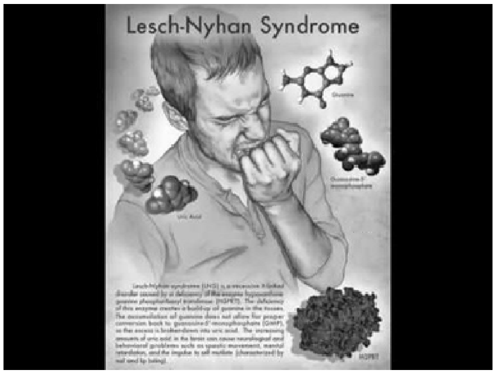

চিত্র ৪. লেশ-নাইহান সিনড্রোমসম্পন্ন শিশুর অবধারিত স্ব-বিকৃতিসাধন।

৫. অ্যান্ড্রোজেন অসহণীয়তা সিনড্রোম (Androgen insensitivity syndrome)

শরীরে পুরুষ হরমোন অ্যান্ড্রোজেনের অস্বাভাবিক গ্রহীতার (abnormal androgen receptors) কারণে এটি একটি X-শৃঙ্খলিত প্রচ্ছন্ন রোগ। এ ধরনের ব্যক্তির রয়েছে স্ত্রীর মতো বাহ্যিক যৌনাঙ্গ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্তন, কিন্তু সে বন্ধা। জরায়ু এবং ফ্যালোপিয়ান টিউব না থাকায় তার মাসিক (menstrual periods) হয় না। তবে তার অন্ডকোষ (testes) রয়েছে এবং সে পুরুষ ক্যারিওটাইপ (46, XY) বহন করে। এ ধরনের ব্যক্তির শরীর থেকে যদি অন্ডকোষ অপসারণ না করা হয়, তাহলে তার অন্ডকোষের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, ঐতিহাসিক দু’জন ব্যক্তিত্ব জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc) এবং রাণী প্রথম এলিজাবেথ (Queen Elizabeth I, যিনি ‘কুমারী রাণী’ নামে অধিক পরিচিত) সম্ভবত অ্যান্ড্রোজেন অসহণীয়তা সিনড্রোমে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁদের অবয়ব, শারীরিক অস্বাভাবিকতা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব, বন্ধ্যাত্য এবং বিয়েতে অসম্মতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে তাঁদের এই অস্বাভাবিক রোগটি ছিল। তাছাড়া পরিচিতদের বিশ্বাস, সাম্প্রতিকতম সময়ের আমেরিকার অভিনেত্রী ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব জেমি লী কার্টিস (Jamie Lee Curtis) একজন অন্ডকোষধারী মহিলা যিনি খুব সম্ভব অ্যান্ড্রোজেন অসহণীয়তা সিনড্রোম দ্বারা আক্রান্ত।

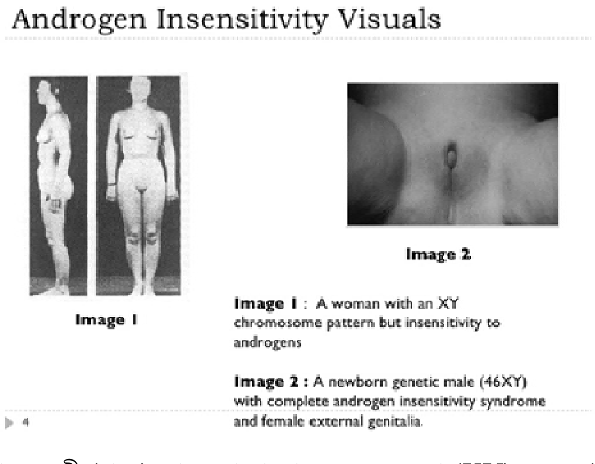

চিত্র ৫. অ্যান্ড্রোজেন অসহণীয়তা সিনড্রোমযুক্ত স্ত্রী (বামে), যার ক্রোমোজোম পুরুষের মতো (XY); পুরুষ (ডানে), যার বাহ্যিক যৌনাঙ্গ স্ত্রীর মতো।

৬. উইলসন্স রোগ (Wilson’s disease)

একটি প্রচ্ছন্ন অটোজোমাল জিনের কারণে উইলসন্স রোগ হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিতে এই রোগটির বিলম্বিত প্রকাশ (delayed on-set) ঘটে। তাই রোগীর জীবনের দ্বিতীয় দশকে অর্থাৎ ১১ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে এটি প্রকাশ পেয়ে থাকে। রোগীর *ATPase membrane copper transport protein* ঘাটতির কারণে রোগটি হয়। যকৃতে ফাইব্রাস টিস্যুর আধিক্য, মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্ষয় এবং প্রস্রাবে অ্যামিনো অ্যাসিড নিঃস্বরণ প্রভৃতি উইলসন রোগের অন্যতম শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য।

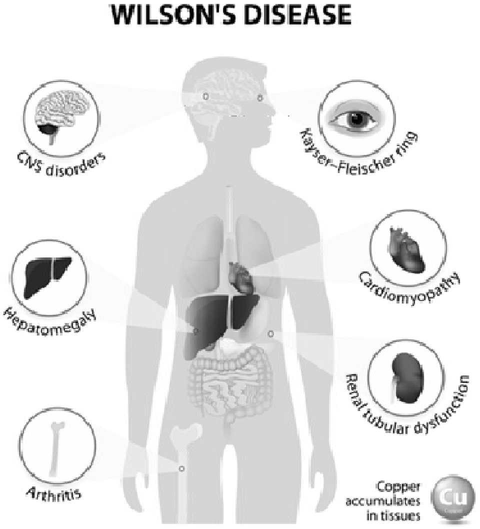

চিত্র ৬. উইলসন রোগে আক্রান্ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

একক-জিনজনিত রোগ-ব্যাধির বিপাকীয় পথরেখা (Metabolic pathways of single-gene disorders)

একটি অত্যাবশ্যকীয় ও কমন অ্যামিনো অ্যাসিড ফিনাইলঅ্যালানিনের উদাহরণ দিয়ে একটি একক-জিন রোগ-ব্যাধি যেমন ফিনাইলকিটোনুরিয়া (PKU)-এর বিপাকীয় পথরেখা বোঝানো যেতে পারে (চিত্র ৭)। খাবারের আমিষ এবং কোষ ও টিস্যুর আমিষ হলো এই অ্যাসিডের প্রধান উৎস। তিনটি পথক্রমে অ্যাসিডটির বিপাক সাধিত হয়- যথা: (১) এটি কোষ-টিস্যুর আমিষে পরিণত হয়; (২) এটি দেহে টাইরোসিন (অন্য আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড) উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়; এবং (৩) অ্যাসিডটি প্রথমে ফিনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড, অতঃপর ফিনাইলল্যাকটিক অ্যাসিড এবং পরিশেষে কার্বনডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়। কিন্তু রোগীর শরীরে ত্রুটিযুক্ত জিনের কারণে ফিনাইলঅ্যালানিন থেকে টাইরোসিন উৎপাদনের জন্য দায়ী এনজাইম ফিনাইলঅ্যালানিন হাইড্রোক্সিলেজ (*phenylalanine hydroxylase*) না থাকায় রোগীর রক্ত ও মূত্রে মাত্রাতিরিক্ত ফিনাইলপাইরুভিক ও ফিনাইলল্যাকটিক অ্যাসিডদ্বয় সঞ্চিত হয়। স্বাভাবিক মানুষে যেখানে প্রতি ১০০ মি.লি রক্ত বা প্রস্রাবে প্রায় ৩০ মি.গ্রা ফিনাইলপাইরুভিক ও ফিনাইলল্যাকটিক অ্যাসিডদ্বয় থাকে, সেখানে PKU রোগীর ক্ষেত্রে এর পরিমান বেড়ে ৩০০ থেকে ১০০০ মি.গ্রা হতে পারে। ফলে রোগীর দেহে PKU-এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়। আমেরিকায় প্রতি ২৫,০০০ শিশু জন্মে ১জন PKU রোগাক্রান্ত শিশু দেখতে পাওয়া যায়।

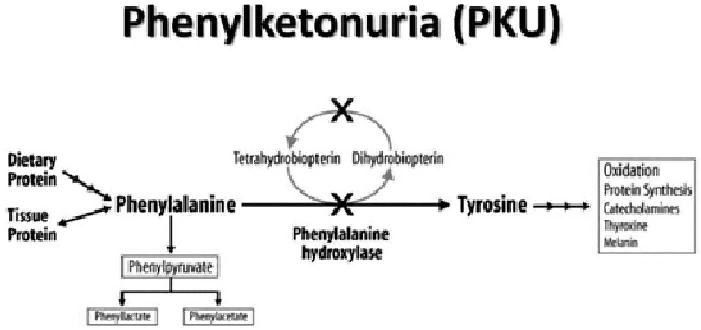

চিত্র ৭. ফিনাইলকিটোনুরিয়া (PKU) রোগ সৃষ্টির কারণ ফিনাইলঅ্যালানিন অ্যামিনো অ্যাসিডর ত্রুটিপূর্ণ বিপাকীয় পথরেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

এবার অন্য আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড টাইরোসিনের বিপাকীয় বিভ্রাটের তিনটি প্রধান পরিণতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। খাবারের আমিষ ও ফিনাইলঅ্যালানিন এই অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রধান উৎস। দেহে এই অ্যাসিড ভেঙ্গে কোষ ও টিস্যুর আমিষ, থাইরয়েড হরমোন, মেলানিন রঞ্জক এবং কার্বনডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়। কিন্তু আক্রান্ত শিশুর ত্রুটিপূর্ণ জিনের কারণে উপরোক্ত বাই-প্রোডাক্টগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হয়, যা নিচে বর্ণিত হলো ঃ

(১) স্বাভাবিক অবস্থায় টাইরোসিন থাইরক্সিনেজ (*thyroxynase*) এনজাইমের উপস্থিতিতে থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরয়েড হরমোন তৈরি করে। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিতে থাইরক্সিনেজ এনজাইমের অনুপস্থিতি জেনেটিক গয়ট্রাস ক্রেটিনিজম (genetic goitrous cretinism) ঘটায়, ফলে রোগী গয়টার বা গলগন্ড রোগসহ শারীরিক ও মানসিক অবসাদগ্রস্থতায় ভোগে।

(২) অপর দিকে টাইরোসিন টাইরোসিনেজ (*tyrosinase*) এনজাইমের উপস্থিতিতে শরীরের ত্বক, চুল ও চোখের মণিতে মেলানিন রঞ্জক উৎপাদন করে। কিন্তু এনজাইমটির অনুপস্থিতিতে মেলানিন রঞ্জক উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় রোগী ধলারোগ বা অ্যালবিনিজমে (oculocutaneous albanism, OCA) আক্রান্ত হয়।

(৩) দেহে টাইরোসিন বিপাকের শেষ পর্যায়ে হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড বা অ্যালক্যাপ্টন (alkapton) এবং পরিশেষে, ফিনাইলঅ্যালানিনের মতোই, কার্বনডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ জিনের কারণে হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড ভেঙ্গে না গিয়ে রোগীর মূত্রে সঞ্চিত হয় এবং রোগীর প্রস্রাব বাতাসের সংস্পর্শে এলে তা কালো বর্ণ ধারণ করে। রোগীর এ অবস্থাকে অ্যালক্যাপ্টোনুরিয়া (alkaptonuria) বা black urine বলে।

বহুজিনজনিত রোগ-ব্যাধি (Polygenic or multifactorial disorders)
এবার আমরা কিছু বহুজিনজনিত রোগ-ব্যাধি নিয়ে আলোচনা করবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের সমস্ত রোগ-ব্যাধির প্রায় ১৩ শতাংশ হলো বহুজিনজনিত (সারণি ১), -যেগুলোর অধিকাংশের সঙ্গেই আমরা বেশ পরিচিত। করোনারি হৃদরোগ থেকে শুরু করে সিজোফ্রেনিয়ার মতো জটিল অসুখ এদের অন্তর্ভূক্ত। বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন, স্থূলতা, মৃগীরোগ, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, অ্যাজমা বা হাঁপানি, আলঝেইমার’স, অটিজম, অটোইমিউন রোগাদি, স্ত্রীলোকের স্তন, ডিম্বাশয় ও কোলোন ক্যান্সার, তালু কাটা, হাইপোথাইরয়েডিজম, ম্যানিক ডিপ্রেশন, পলিসিস্টিক কিডনি রোগ, ইরিটেবল বাউল সিন্ড্রোম বা আইবিএস, মানসিক অবসাদগ্রস্থতা, মুড ডিসঅর্ডার, বাত বা আর্থ্রাইটিস ইত্যাদি অসুখগুলো বহুজিনজনিত। নিচে কয়েকটি সাধারণ বহুজিনজনিত রোগ-ব্যাধির কারণ, ঝুঁকি-প্রবণতা, লক্ষণ, শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে তথ্যাদি আলোচিত হলো।

১. হৃদরোগ (Coronary heart disease, CHD)

কারণ
করোনারি ধমনির ভিতরের পথ (lumen) ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়াকে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis) বলা হয় (চিত্র ৮)। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হৃদরোগের একটি অন্যতম কারণ। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে হৃদপিন্ডে রক্ত প্রবাহ কমে যায়। অন্য কথায়, হৃদপিন্ড যথেষ্ট পরিমান অক্সিজেন সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে হৃদরোগ দেখা দেয়।

ঝুঁকি-প্রবণতা
ব্যক্তির বয়স, বংশগত ধারা (heredity) এবং জীবনাচার (life-style) হৃদরোগের ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত। তাছাড়া, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ (>১৪০/৯০ মি.মি পারদ), রক্তের উচ্চ কলেস্টেরল মাত্রা (>১৫০ মি.গ্র/ডেসিলি.), ওজনাধিক্য (over-weight), স্থূলতা (obesity), ধুমপান, দৈহিক পরিশ্রমহীনতা, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, উদ্বিগ্নতা (anxiety) এবং মানসিক চাপ (stress) ইত্যাদিও হৃদরোগের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত।

লক্ষণ
বুকে ব্যথা (angina pectoris), হার্ট অ্যাটাক বা এমআই (MI, myocardial infarction), হার্ট ফেলিওর বা নিঃশ্বাস স্বল্পতা (shortness of breath) ইত্যাদি হৃদরোগের প্রধান লক্ষণগুলোর অন্যতম।

শনাক্তকরণ
রোগীর ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম বা ইসিজি করালে হৃদস্পন্দনের হৃদরোগজনিত অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। রোগীর ধমণিতে কোন ব্লক আছে কি-না তা’ অ্যাঞ্জিওগ্রাম (angiogram) পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। হৃদপিন্ডের প্রকোষ্ঠগুলোতে রক্ত প্রবাহ

ঠিকমত হচ্ছে কি-না তা' পরীক্ষার জন্য কার্ডিয়াক ক্যাথেটোরাইজেশন (catheterization) করানো হয়। তাছাড়া, রোগীর ইকোকার্ডিওগ্রাম (echocardiogram) করলে হৃদ-প্রকোষ্ঠ ও ভাল্বের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

চিকিৎসা সেবা

রোগীর অবস্থা অনুযায়ী জীবনাচার ব্যবস্থাপনা (life-style management), ওষুধ-পত্রাদি (medication) এবং শল্য-চিকিৎসা বা অস্ত্রপচার (surgery)- এই তিন পদ্ধতিতে হৃদরোগীর চিকিৎসা সেবার সুযোগ রয়েছে। জীবনাচার ব্যবস্থাপনার আওতায় স্বল্প-চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ, ধুমপান বর্জন, বহুমূত্র ও উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা' নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত হাঁটা ইত্যাদি পরামর্শ দেয়া হয়। ওষুধ-পত্রাদি হিসেবে বুক-ব্যথা ও কলেস্টেরল কমানোর ওষুধ, বেটা-ব্লকার ও ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ওষুধ রয়েছে। উপরোক্ত চিকিৎসাগুলো কাজে না এলে রোগীর অস্ত্রপচার করানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রোগীর অবস্থাভেদে স্টেনটিং (stenting) বা রিং পরানো হয়- যার ফলে করোনারি ধমণিতে প্রয়োজনীয় রক্ত প্রবাহ বাড়ে। থ্রম্বোসিসের ফলে নালীতে রক্তজমাট বেঁধে থাকলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (angioplasty) বা বেলুনিং-এর মাধ্যমে তা' চূর্ণ করা হয়ে থাকে। রোগীর ক্ষেত্রে স্টেনটিং বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি প্রযোজ্য না হলে রোগীকে ওপেন-হার্ট বাই-পাস সার্জারির মাধ্যমে বিপদমুক্ত করানোর ব্যবস্থা রয়েছে (চিত্র ৯)।

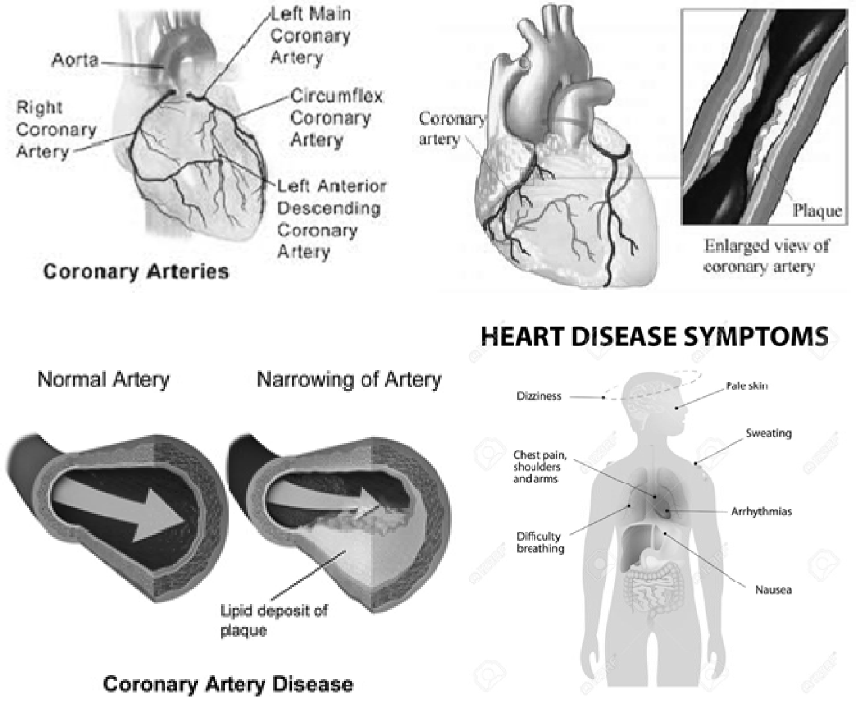

চিত্র ৮. করোনারি ধমণির বিস্তৃতি ও সরুকরণ (উপর), প্লেক জমা (নিচের বাম) ও হৃদরোগের সাধারণ লক্ষণসমূহ দেখানো হয়েছে।

২. বহুমূত্র (*Diabetes mellitus*, DM)

কারণ

এই রোগটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে দেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বহুমূত্র রোগী রয়েছে। বিপাকীয় ত্রুটিজনিত কারণে যখন অগ্নাশয় দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান ইনস্যুলিন উৎপাদনে ব্যর্থ হয়, তখন আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত ও প্রস্রাবে মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ বা সুগার শনাক্ত করা যায়, যেটি বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ নামে পরিচিত। এটি সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে- যথা টাইপ-১ বা ইনস্যুলিন-নির্ভর এবং টাইপ-২ বা ইনস্যুলিন-অনির্ভর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের জুভেনাইল ডায়াবেটিস (juvenile diabetes) টাইপ-১ এবং গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (gestational diabetes) টাইপ-২ গোত্রভূক্ত।

ঝুঁকি-প্রবণতা

বংশগত বা পারিবারিক, স্থূলতা, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যগ্রহণ, কায়িকপরিশ্রমহীনতা, মাত্রাতিরিক্ত সরল শ্বেতসার খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বহুমূত্র রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

লক্ষণ

মাত্রাতিরিক্ত প্রস্রাব, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, শুষ্ক মুখ, চুলকানিপ্রবণ ত্বক, ওজন কমে যাওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি, দুর্বলতা, সহজেই রেগে যাওয়া বা খিটখিটে মেজাজ, ক্লান্তি ও তন্দ্রাভাব, আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য বিপাকীয় সমস্যা, হঠাৎ রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো বহুমূত্র রোগের নির্দেশক।

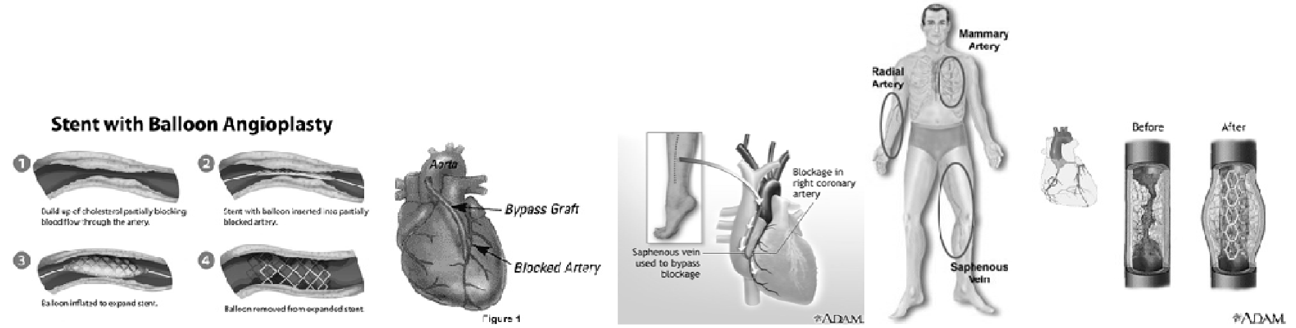

চিত্র ৯. উপরের চিত্রে স্টেন্টিং ও অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, ব্লক হওয়া করোনারি ধমণি এবং রোগীর দেহে ধমণি নির্বাচনের স্থানসমূহ, এবং নিচের চিত্রে বাই-পাস সার্জারির পর ধমণির অবস্থার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩. টাইপ-১ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

টাইপ-১ ডায়াবেটিস	টাইপ-২ ডায়াবেটিস
(ক) গ্রহণের পর খাদ্য পাকস্থলিতে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়।	(ক) গ্রহণের পর খাদ্য পাকস্থলিতে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়।
(খ) উৎপাদিত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে।	(খ) উৎপাদিত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে।
(গ) অগ্নাশয় ইনস্যুলিন উৎপাদন করতে পারে না, করলেও খুব অল্প পরিমানে উৎপাদন করে।	(গ) অগ্নাশয় ইনস্যুলিন উৎপাদন করে।
(ঘ) ইনস্যুলিন রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে না, করলেও খুব অল্প পরিমানে করে।	(ঘ) ইনস্যুলিন রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে।
(ঙ) ফলে রক্তপ্রবাহে গ্লুকোজ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।	(ঙ) কিন্তু রক্তপ্রবাহে বা দেহকোষে গ্লুকোজ প্রবেশ করে না, বরং গ্লুকোজ রক্তনালীতে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

শনাক্তকরণ

ডিজিটাল DM রিডার বা গ্লুকোমিটার (glucometer)-এর সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজে একজন ব্যক্তির বহুমুত্র রোগ শনাক্ত করা যায়। এছাড়া ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমেও নিশ্চিতভাবে রোগটি নির্ণয় করা হয়।

চিত্র ১০. ডায়াবেটিস পরিমাপক ডিজিটাল গ্লুকোমিটার।

চিকিৎসা সেবা

জীবনাচার ব্যবস্থাপনা, নির্বাচিত খাদ্যগ্রহণ (চিত্র ১১) ও ওষুধ-পত্রাদি প্রয়োগের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের (ADA) সুপারিশ মতে টাইপ-১ ডায়াবেটিসের জন্য নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, সযত্নে নিয়ন্ত্রিত খাদ্যগ্রহণ এবং ইনস্যুলিন ইঞ্জেকশন। আর টাইপ-২ ডায়াবেটিসের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ রোগীর জন্য ওজন

কমানো, ব্যায়াম এবং কম-চর্বিযুক্ত খাবার, মধ্যম আমিষ ও জটিল শ্বেতসার খাদ্যগ্রহণ; শতকরা ৫০ ভাগ রোগীর জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি এবং বাকি ৪০ শতাংশ রোগীর জন্য ইনস্যুলিন ইঞ্জেকশন প্রেসক্রাইব করা হয়।

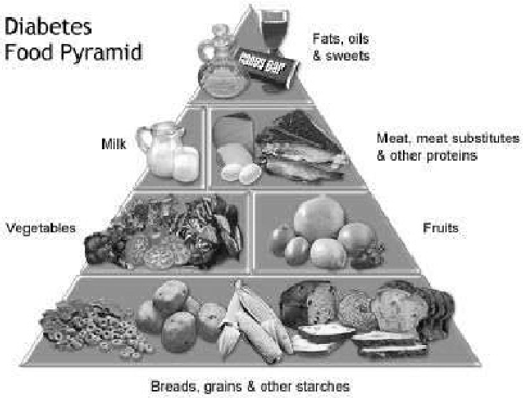

চিত্র ১১. ডায়াবেটিস রোগীর জন্য সুপারিশকৃত খাবার পিরামিড।

৩. উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension, HTN)

কারণ

প্রায় ৯৫% ক্ষেত্রে এ রোগের নির্দিষ্ট কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাকি ৫ শতাংশের জন্য ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং কিডনি ও যকৃতের অসুখকে দায়ী করা হয়ে থাকে। মানুষের জন্য রোগটি 'নীরব ঘাতক' হিসেবে পরিচিত কারণ চিহ্নিতকরণের আগেই এটি রোগীর হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক কিংবা হার্ট ও কিডনি ফেইলিওরের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যাহোক, উচ্চ রক্তচাপের মূখ্য কারণগুলোর মধ্যে খাদ্যে অতিরিক্ত লবণের ব্যবহার, দেহে রক্তের আয়তন বেড়ে যাওয়া, বংশগত রোগ, উৎকণ্ঠাসম্পন্ন জীবন-যাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত অবস্থা, কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিনোদন-ড্রাগের ব্যবহার, গর্ভধারণ কিংবা হরমোন থেরাপি ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের গৌণ কারণ হিসেবে বিবেচিত।

ঝুঁকি-প্রবণতা

ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া (sleep apnea), উচ্চ লবণ ও মশলাযুক্ত খাবার, বসে বসে কাজ করার পেশা, শারীরিক কর্মহীনতা, স্থূলতা, প্রচন্ড মাদকাশক্তি, মানসিক চাপ ও উৎকণ্ঠা এবং খাবারে ভিটামিন কে এবং ডি-এর মারাত্মক স্বল্পতা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত।

লক্ষণ

বুক ধড়ফড় করা (palpitation), মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, চোখে হঠাৎ ঝাপসা দেখা, হাঁটতে গিয়ে শরীর টলমল করা, শ্বাস-স্বল্পতা, মাথা বা ঘাড়ের পেছনে ব্যথা বা চাপ অনুভুত হওয়া ইত্যাদি এই রোগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

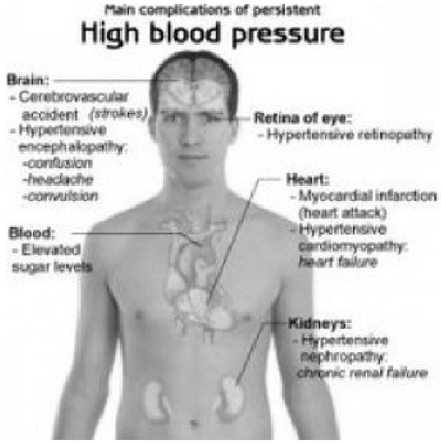

চিত্র ১২. উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতা।

শনাক্তকরণ

স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphygmomanometer) বা বিপি (BP) মেশিনের সাহায্যে রোগীর রক্তচাপ পরিমাপ করে এটি সহজেই শনাক্ত করা যায়। আমেরিকা হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (২০০৩) নিচে বর্ণিত রক্তচাপের হিসেব থেকে রোগীর উচ্চ রক্তচাপ শনাক্ত করে থাকে (সারণি ৪)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন কোন ব্যক্তির রক্তচাপ বাড়িতে স্বাভাবিক বা কম, কিন্তু ক্লিনিকে কিংবা হাসপাতালে বেশি পাওয়া যায়। রোগীর এ ধরনের উচ্চ রক্তচাপকে হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন (white coat hypertension) বলে।

সারণি ৪. উচ্চ রক্তচাপ শনাক্তকরণে ব্যবহৃত সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক প্রেশারদ্বয়ের পরিমাপ।

শ্রেণিবিভাগ	সিস্টোলিক প্রেশার (মি.মি পারদ)	ডায়াস্টোলিক প্রেশার (মি.মি পারদ)
সুস্থ/স্বাভাবিক	৯০-১১৯	৬০-৭৯
উচ্চ রক্তচাপ-পূর্ব অবস্থা	১২০-১৩৯	৮০-৮৯
উচ্চ রক্তচাপ-ধাপ ১	১৪০-১৫৯	৯০-৯৯
উচ্চ রক্তচাপ-ধাপ ২	≥১৬০	≥১০০
ইমার্জেন্সি উচ্চ রক্তচাপ*	≥১৮০	≥১১০

* রোগীকে তাৎক্ষণিক ক্লিনিকে বা হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন।

চিকিৎসা সেবা

উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ক্ষেত্রে অস্ত্রপচারের সুযোগ নেই বললেই চলে। জীবনাচার ব্যবস্থাপনা এবং ওষুধ-পত্রাদির সাহায্যে সাধারণত রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। দেহের চর্বি ঝরানো, ধুমপান ও মাদক দ্রব্যাদি বর্জন, চিকিৎসকের পরামর্শ মতো দৈহিক পরিশ্রম বাড়ানো, স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ এবং নিজের ফিটনেস ধরে রাখার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাছাড়া রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখার জন্য অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ওষুধ, ডিউরেটিক্স ওষুধ (রেচনের মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত লবণ ও পানি নিঃসরণের ফলে রক্তচাপ কমে যাবে) এবং বেটা ব্লকারস্ ও ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস্ ব্যবহার করলে নিয়ন্ত্রিত হৃদস্পন্দন রক্তনালীসমূহ রিল্যাক্স করার সুযোগ পাবে।

৪. মৃগীরোগ (Epilepsy or seizure disorder)

কারণ

এই রোগটি অনেকগুলো পৃথক গুণসম্পন্ন ক্রনিক স্নায়ুবিক অসুখের বৈশিষ্ট্যের ধারক। মূলত মৃগীরোগী মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের স্বল্পকালীন বাধার কারণে হয়ে থাকে। তাই মৃগীরোগের নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এটি দু'প্রকার- যথা আংশিক আক্রমন (partial seizure) ও সাধারণ আক্রমন (general seizure), যা আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ থেকে আলাদা করা যায়। উভয় ক্ষেত্রে মৃগীর আক্রমনটি অনিয়মিত বিরতিতে পুণঃপুণ খিঁচুনির মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

লক্ষণ

আংশিক আক্রমণ ঃ এতে মস্তিষ্কের যেকোন একদিক আক্রান্ত হয়; দেহের অনিয়ন্ত্রিত ঝাঁকুনি, ঘাম ঝরা, আতঙ্কগ্রস্থ বা ভয়ের অনুভূতি, দৃষ্টি কিংবা শ্রবণহীনতা, পেটে অস্বস্তিবোধ, উপরের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, দিবাস্বপ্নের অনুভূতি, মুখমন্ডলের পেশির নাচন এবং খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। আংশিক আক্রমন আবার দু'ধরনের হতে পারে ঃ সহজ আংশিক (যাতে রোগী জ্ঞান হারায় না) এবং জটিল আংশিক (রোগী জ্ঞান হারায়) -পরবর্তীতে যেটি সাধারণ আক্রমনে রূপান্তরিত হতে পারে।

সাধারণ আক্রমণ ঃ এতে মস্তিষ্কের উভয় দিক আক্রান্ত হয়; জ্ঞান হারানো, চিৎকার, পিঠ বেঁকে যাওয়া (টোনিক দশা), পুরো শরীর ঝাঁকানো ও রক্তিম মুখমন্ডল (ক্লোনিক দশা), শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যাওয়া, মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

চিত্র ১৩. মৃগীরোগের জটিল আক্রমনের টোনিক ও ক্লোনিক দশা।

শনাক্তকরণ

উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলো থেকে প্রাথমিকভাবে মৃগীরোগ শনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে রোগীর মস্তিষ্কের EEG (electroencephalogram), মাথার CT (computed tomography) স্ক্যান অথবা MRI (magnetic resonance imaging), মস্তিষ্কের আক্রান্ত অঞ্চলের PET (positron emission tomography) স্ক্যান এবং কিডনি ও লিভারের কিছু বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে মৃগীরোগের ধরণ ও গভীরতা নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা সেবা

মৃগীরোগের সম্পূর্ণ ও নিশ্চিত আরোগ্য নেই। তবে জীবনাচার ব্যবস্থাপনা, খাবার, ওষুধ-পত্রাদি এবং অস্ত্রপচারের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যেতে পারে, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত ভাল জীবন-যাপন করতে পারে। প্রচুর অবসর, চাপমুক্ত বিনোদন এবং ব্যায়াম জীবনাচার ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপায়। শিশু ও তরুণদের ক্ষেত্রে কেরাটোজেনিক (keratogenic) অর্থাৎ উচ্চ চর্বিযুক্ত ও কম শ্বেতসারযুক্ত খাবার ভাল ফলদায়ক। ওষুধ-পত্রাদির মধ্যে অ্যান্টিএপিলেপটিক ও অ্যান্টিকনভালসিভ ড্রাগ ডায়াজিপাম (Diazepam) অন্যতম- যেটি ৮০-৮৫% মৃগীরোগীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। বাকি ১৫-২০ শতাংশ জটিল রোগীর ক্ষেত্রে অস্ত্রপচারের প্রয়োজন পড়ে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, মৃগীরোগীর মস্তিষ্কের আক্রান্ত অংশে অস্ত্রপচার প্রায়শ ঝুঁকিপূর্ণ ও এটি ভাল ফলাফল বয়ে আনে না। কারণ জটিল এই অস্ত্রপচারের সাফল্য তথা আরোগ্যের হার নিতান্তই কম।

৫. স্থূলতা (Obesity)

কারণ

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ক্যালরিসম্পন্ন খাদ্যগ্রহণের ফলে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চয়ই হলো স্থূলতা বা মুটিয়ে যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অতিরিক্ত প্রতি ৩৫০০ ক্যালরি গ্রহণের ফলে ১ পাউন্ড উদ্বৃত্ত চর্বি ওজন বাড়িয়ে থাকে।

ঝুঁকি-প্রবণতা

স্থূলতা প্রধানত বংশগত (hereditary), কারণ মানুষ ও ইঁদুরে গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় ২৫০-এরও অধিক জিন মুটিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, প্রাণীর বহুজিন (polygenes) ও জীবনাচার (life-style), খাদ্যাভাস, শারীরিক পরিশ্রমহীনতা, পেশা ইত্যাদির মধ্যেকার একটি জটিল প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ হলো স্থূলতা।

লক্ষণ ও শনাক্তকরণ

স্থূলতার প্রাথমিক লক্ষণ হলো ওজন বেড়ে যাওয়া, পরিধেয় পোশাক আঁট-শাঁট (টাইট) অনুভুত হওয়া এবং বড় মাপের পোশাকের প্রয়োজন হয়ে পড়া। তাছাড়া, কোমর ও তলপেটে অতিরিক্ত চর্বি জমাও স্থূলতার অন্যতম লক্ষণ। তবে বৈজ্ঞানিকভাবে বডি ম্যাস এনডেক্স বা বিএমআই (BMI)-এর মান থেকে একজন ব্যক্তির স্থূলতা নিশ্চিত হওয়া যায় (সারণি ৫ ও চিত্র ১৪)। বিএমআই হলো ঃ কিলোগ্রামে শারীরিক ওজন ÷ মিটার বর্গে উচ্চতা; অর্থাৎ $BMI = kg/m^2$।

সারণি ৫. শরীরের BMI পরিমাপক চার্ট।

শ্রেণিবিভাগ	BMI মান (kg/m^2)
স্বাভাবিক/সুস্থ (normal)	<২৫
অতি-ওজন (over-weight)	২৫-২৯.৯
স্থূলকায় (obese)	≥৩০

চিত্র ১৪. BMI মানের উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক, অতি-ওজনসম্পন্ন ও স্থূলকায় ব্যক্তি শনাক্তকরণ।

চিকিৎসা সেবা

মানুষের শরীরে বেশ কিছু স্থূলতাজনিত জটিলতা দেখা দেয়। তন্মধ্যে করোনারি হৃদরোগ, ফুসফুস সম্পর্কীত শ্বাসকষ্ট, পিত্তথলির জটিলতা, ফ্যাটি লিভার, বিভিন্ন মেয়েলি রোগ-ব্যাধি, অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা গেঁটে বাত, অগ্নাশয়ের প্রদাহ (pancreatitis), চক্ষুশূল (cataract), গাউট (gout) বা বাত এবং পা ও হাতের শিরার প্রদাহ বা ফ্লিবাইটিস (phlebitis) অন্যতম। অন্যান্য বিপাকীয় রোগ-ব্যাধির মতো স্থূলতাজনিত সমস্যার চিকিৎসা সেবা জীবনাচার ব্যবস্থাপনা, ওষুধ-পত্রাদি ও পরিশেষে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে করা যায়।

ডায়েটিশিয়ান বা পুষ্টিবিদের পরামর্শক্রমে ভারসাম্য এবং কম-ক্যালরিযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, নিয়মিত জগিং কিংবা বাড়ির বাইরে হাঁটা, অন্তঃকক্ষ ট্রেডমিলে হাঁটা ইত্যাদি জীবনাচার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত। তবে ওষুধ-পত্র খেয়ে স্থূলতা কমানো খুব একটা ভাল ফল বয়ে আনে না, কারণ ক্ষুধা কমানোর (appetite depressant) ও ওজন কমানোর ওষুধের (যেমন, Sibutramin, Meridia) বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।

যাদের BMI-এর মান ৪০ কিংবা বেশি, তাদের ক্ষেত্রে অস্ত্রপচারের সুযোগ রয়েছে। লাইপোসাকশন (liposuction) এবং গ্যাস্ট্রেকটমি (gastrectomy)-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। তলপেট, উরু ও হাত-পায়ের অতিরিক্ত চর্বি যন্ত্রের সাহায্যে শুষে বের করে নেয়া হলো লাইপোসাকশন। আর পাকস্থলির আয়তন গ্যাস্ট্রেকটমি, গ্যাস্ট্রিক ব্যান্ডিং বা গ্যাস্ট্রিক বাইপাসের মাধ্যমে কমিয়ে ফেলা যায় (চিত্র ১৫)। তাই সহজেই অনুমেয় যে, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যগ্রহণের ঝক্কি-ঝামেলা কিন্তু কম নয়!

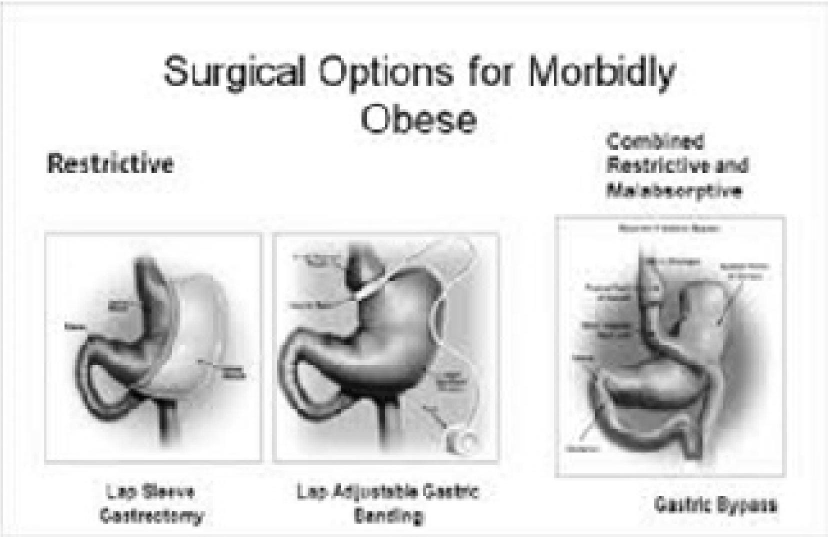

চিত্র ১৫. মারাত্মক স্থূলতাজনিত জটিলতায় পাকস্থলির অস্ত্রপচার।

তথ্যসূত্র:

Emery, AEH & Mueller, RF. 1992 *Elements of Medical Genetics.*
Novitski, E. 1977. *Human Genetics.*
Islam, MS. 2018. *Selected Lectures on Genetics*.
Wikipedia, 2019.
Internet sources, 2019.

ইস্টার আইল্যান্ডের দূর্ভাগ্য

মো. সাজ্জাদুর রহমান শাওন
এমএস (ইকোলজি) ২০১৮; রোল ৬৭০১।

একঝাঁক প্রশ্ন দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের শুরু। স্রষ্টার অভিশাপ? এলিয়েন? নাকি নিজেদের কর্মফল? কি ঘটেছিল ইস্টার আইল্যান্ডের ভাগ্যে? কিভাবে একটি জনবহুল দ্বীপ জনশূন্যে পরিণত হল? কোথা থেকেই বা আসলো ২০-৩২ ফুট লম্বা, ৫০-৬০ টন ওজনের ওই কিম্ভূতকিমাকার মনুষ্য আকৃতির বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তিগুলো? কাদের কারসাজি এগুলো? রহস্যময় ইস্টার আইল্যান্ড আর তাদের আদিবাসীদের সাথে ঘটে যাওয়া নির্মম বাস্তবতার কথা জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় ২০ লাখ বছর পূর্বে।

চিলি থেকে প্রায় ৩৫১২ কিলোমিটার দূরে উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে সৃষ্টি হয় ১৬৩.৬ বর্গ কিলোমিটারের এই দ্বীপটি। উত্তাল মহাসাগর ফেটে বের হওয়া আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা সমুদ্রের পানির সংস্পর্শে এসে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠে ১৫.৩ মাইল লম্বা এবং ৭.৬ মাইল চওড়ার এই ত্রিভুজাকার দ্বীপটি। আর এই বিরাণ দ্বীপটি মানুষের আয়ত্তে আসে আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। পলিনেশিয়া থেকে আগত রাপা নুই (Rapa Nui) জনগোষ্ঠীরাই ইস্টার দ্বীপের কিংবদন্তী প্রথম বসতি স্থাপনকারী। এই দ্বীপটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম (ইংল্যান্ড), সেন্ট পিটার্সবার্গ মিউজিয়াম (রাশিয়া) এবং নিউসাউথ ওয়েলস্ মিউজিয়ামে (অস্ট্রেলিয়া) রক্ষিত বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে।

এই দ্বীপটি আধুনিক সভ্য জনগোষ্ঠীর নজরে আসে ১৭২২ সালে। ডাচ এক্সপ্লোরার জ্যাকব হে পাওয়া (Jacobo Hey Paoa)-এর মাধ্যমে। সাগরে ঘুরতে ঘুরতে বিশুদ্ধ পানি এবং খাবারের আশায় তার জাহাজ ভেড়ে ইস্টার আইল্যান্ডে। পৃথিবীর মূল ভূখন্ড থেকে এত দূরে মানুষ দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি তাদের ইউরোপীয় পোশাক এবং অলংকারের বিনিময়ে খাবার এবং পানি সাহায্য চান। তবে রাপা নুইরা তাদের ভালভাবে গ্রহণ করেননি। ফলে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং বেশ কয়েকজন রাপা নুই প্রাণ হারান। অধিবাসীদের বাঁধার মুখে তারা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। এরপর ৫২ বছর পর ১৭৭৪ সালে আসেন ক্যাপ্টেন কুক। তার আর্টিস্ট সিমন রবার্ট এই বিচিত্র দ্বীপটি ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকেন এবং মানচিত্র তৈরী করেন। এরপরই এই দ্বীপ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আলোড়ন তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণা, ফসিলের কার্বন ডেটিং ও প্রাপ্ত নিদর্শন বিশ্লেষণ করে জানা যায় এই দ্বীপটির মানুষের ভাগ্যের নির্মম পরিণতির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আর তা হল প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

চিত্র: ইস্টার আইল্যান্ডের পনেরটি কিম্ভূতকিমাকার মনুষ্য আকৃতির মূর্তি।

এই দ্বীপের মানুষের প্রধান জীবিকা নির্বাহ হত সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের উপর। এরা সামুদ্রিক পাখি এবং প্রকৃতির পূজা করতো। তাদের সন্তুষ্টি এবং পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করার জন্য নির্মাণ করত এই বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি। এই দ্বীপে প্রায় ৮৮৭টি মূর্তি আছে। অনেকে মনে করেন, ইনকা সভ্যতা থেকে আসে এই মূর্তির ধারণা। এই মূর্তি সরানোর জন্য ল্যান্ড রোলার হিসেবে ব্যবহৃত এই দ্বীপের একমাত্র কাষ্ঠল উদ্ভিদ টরোমিরো। এই দ্বীপের স্বর্ণযুগে ক্রমাগত জনবসতি বাড়তে থাকে।

মানুষ বন জঙ্গল উজাড় করে শুরু করে বসতি নির্মাণ। ব্যাপক হারে শুরু হয় বৃক্ষ নিধন। যেই টরোমিরো ছিল তাদের নৌকা নির্মাণ তথা সমুদ্রে গমন এবং জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপাদান, সেই টরোমিরো উদ্ভিদের ব্যাপক নিধনের ফলে এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায় বৃক্ষটি। অর্থাৎ ইস্টার আইল্যান্ডের শেষ টরোমিরো গাছ কাটার মধ্য দিয়ে এই দ্বীপের মানুষ নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ে ফেললো। নৌকা বানানোর কাঠ না থাকায় ধীরে ধীরে সমুদ্রে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। শুরু হল খাদ্যাভাব এবং কলহ-বিবাদ। কমতে থাকলো মানুষ। ক্যাপ্টেন কুক যখন ১৭৭৪ সালে এই দ্বীপে আসেন তখন সেখানে আর মাত্র ২-৩ হাজার মানুষ বেঁচে ছিল বলে তিনি জানান। পরে অন্যান্য ইউরোপিয়ানদের আগমন ঘটলে এই সামান্য আদিবাসীদেরকেও জোর করে দাস হিসেবে বিক্রি করা শুরু হয়। বিদেশিদের অত্যাচার-নির্যাতন ও বিভিন্ন রোগে-শোকে কমতে থাকে দ্বীপবাসির সংখ্যা। ১৮৭৭ সালে এদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র ১১১ জনে! কি নির্মম পরিহাস! একটা পুরো জাতির জনসংখ্যা নেমে এলো মাত্র ১১১ জনে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে ১৯৯৫ সালে UNESCO একে World Heritage Site ঘোষণা করলে এই দ্বীপে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়। বর্তমানে এখানে আধুনিক বিমানবন্দর, হোটেল ও মোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে। মাঝখানে এদের সেই আদিম আদিবাসীদের তেমন কোন খোজ পাওয়া না গেলেও বর্তমানে জানা যাচ্ছে এই দ্বীপের বর্তমান জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রায় ৩৬টি বংশধর ওই রাপা নুই গোষ্ঠীর!

পরিশেষে ইস্টার আইল্যান্ডের এই এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা ১৫টি মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। এরা যেন আমাদের ডেকে বলছে- ‘হে মানব গোষ্ঠী, আমাদের দেখে শিক্ষা নাও, নিজেদের স্বার্থপরতায় নিজের আত্মতৃপ্তি তথা পেট পূজার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যে অতিশোষণ (over exploitation) তোমরা করছো তা শীঘ্রই তোমাদের বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে; আর সে দিন হয়ত খুব বেশী দূরে নয়’।

তথ্যসূত্র ঃ

Sir David Attenborough. *The Lost God of Easter Island.*
Welcome to Rapa Nui – Isla de Pascua – Easter Island http://bit.ly/2mXXbVH
From Genocide to Ecocide: The Rape of Rapa Nui
Pinart, Alphonse (1877). Voyage à l'Ile de Pâques (Océan Pacifique).
Territorial division of Chile. National Statistics Institute.
http://bit.ly/2oCCjnf
http://bit.ly/2nW0woP
Rapa Nui National Museum, Conaf.

Bioluminescence in the living world

Md. Badsha Alam
4th year (Honours); Roll: 9185

Bioluminescence (Gr. bios-living; lumen-light) is the emission of light from living organisms such as fireflies, dinoflagellate protozoans and bacteria as the result of internal, typically oxidative reactions. Luminescence is the low-temperature emission of light produced especially by physiological processes, chemical action, friction or by electrical action. More precisely, luminescence is the creation of light by processes that do not involve heat. Bioluminescence therefore is a type of chemiluminescence due to the production of light by a chemical reaction. There are two molecules that are produced by the organisms, luciferin, a pigment and luciferase, an enzyme. The chemical reaction that produces luminescence can occur within or outside the cell.

Historical background

Bioluminescence has excited interest of investigator since the time of Aristotle. Before the development of the safety lamp for use in coal mines, dried fish skins were used in Britain and Europe as a weak source of light. This experimental form of illumination avoided the necessity of using candles which risked sparking explosions of firedamp. Another safe source of illumination in mines was bottles containing fireflies.

American zoologist Edmund Newton Harvey (Fig. 1) published in 1920 a monograph, *The Nature of Animal Light*, summarizing early work on bioluminescence in animals. Harvey noted that Aristotle mentioned about light produced by dead fish and flesh, and that both Aristotle and Pliny the Elder (in his *Natural History*) mentioned light from damp wood. He also records that Robert Boyle experimented on these light sources, and showed that both they and the glow-worm require air for light to be produced. Harvey notes that in 1753, J. Baker identified the flagellate *Noctiluca* "as a luminous animal" "just visible to the naked eyes", and in 1854 Johann Florian Heller (1813-1871) identified strands of fungi as the source of light in dead wood. Tuckey, in his posthumous 1818 *Narrative of the Expedition to the Zaire*, described catching the animals responsible for luminescence. Charles Darwin noticed bioluminescence in the sea, describing it in his Journal.

The French pharmacologist Raphaël Dubois carried out work on bioluminescence in the late nineteenth century. He studied click beetles (*Pyrophorus*) and the marine bivalve mollusc *Pholas dactylus*. He refuted the old idea that bioluminescence came from phosphorus, and demonstrated that the process was related to the oxidation of a specific compound, which he named luciferin, by an enzyme. More recently, Martin Chalfie, Osamu Shimomura and Roger Y. Tsien won the 2008 Nobel Prize in Chemistry for their 1961 discovery and development of green fluorescent protein as a tool for biological research. In 2016, deep sea bioluminescent corals were captured for the first time in colour HD videos.

The process of bioluminescence

Bioluminescence results because of a certain Biochemical reaction. This can be described as a chemiluminescent reaction which involves a direct conversion of chemical energy transformed to light energy (Burr 1985, Patel 1997 and Herring 1978). The reaction involves the following elements:

Enzymes (luciferase): Biological catalysts that accelerate and control the rate of chemical reactions in cells.

Photons: Packs of light energy.
ATP (adenosine triphosphate: The energy storing molecule of all living organisms.

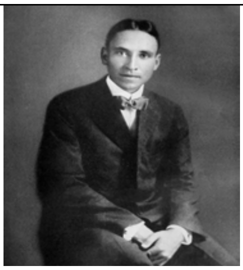 **Fig. 1** Edmund Newton Harvey	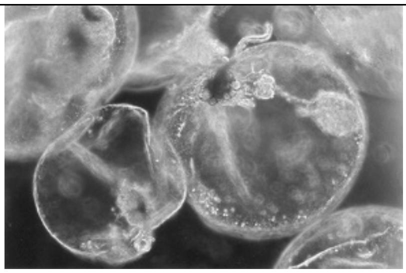 **Fig. 2** Bioluminescent dinoflagellate *Noctiluca scintillans*
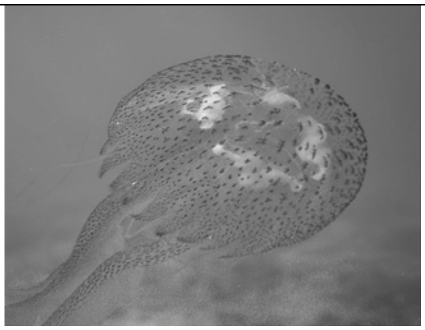 **Fig. 3** Jelly fish *Pelagia noctiluca*	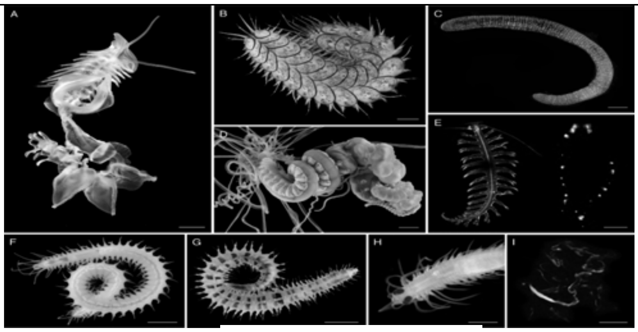 **Fig 4** Bioluminescent annelids
 Fig. 5 Firefly	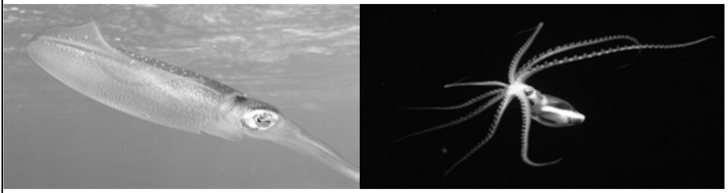 **Fig. 6** Bioluminescent molluscs: Big fin reef squid (left), pelagic octopus (right)
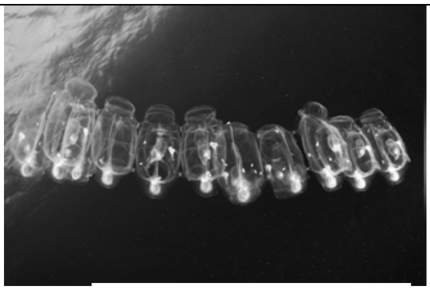 **Fig. 7** Sea salps *Pegea confoederata*	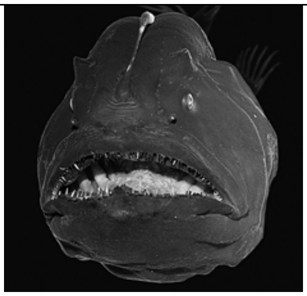 **Fig. 8** Deep sea anglerfish *Diceratias pileatus*
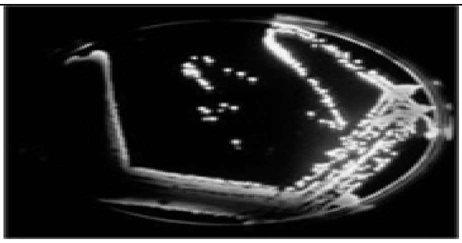 **Fig. 9** Bioluminescent bacteria	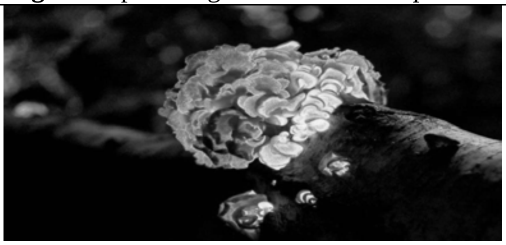 **Fig. 10** Bioluminescent saprophytic fungus, bitter oyster mushroom *Panellus stipticus*

Substrate (luciferin): A specific molecule that undergoes a chemical charge when affixed by an enzyme.

Oxygen: As a catalyst. However, a simplified formula of the bioluminescent reaction:
ATP (energy) + Luciferin (substrate)+ Luciferase (enzyme) + O_2 (oxidizer) = Light (photons)

Two basic stages of bioluminescent reaction

1) The reaction involves a substrate (D-luciferin), combining with ATP, and oxygen which is controlled by the enzyme (luciferase). Luciferins and luciferase differ chemically in different organisms but they all require molecular energy (ATP) for the reaction.

2) The chemical energy in stage one excites a specific luminescent molecule, the combining of luciferase and luciferin. The excitement is caused by the increased energy level of the luminescent molecule. The result of this excitement is decay which is manifested in the form of photon emissions, which produces the light. The light given off does not depend on light or other energy taken in by the organism and is just the byproduct of the chemical reaction and is therefore cold light.

Bioluminescence in different organisms

Protozoa

There are numerous luminescent species are found among protozoa, *viz*., marine radiolarians and dinoflagellates (Fig. 2). The light producing granules are located throughout the organism. Dinoflagellates are the main eukaryotic protists that are capable of producing light. Within this group, bioluminescence is present in a number of ecologically important species, many of which formblooms. Several bioluminescent species are cosmopolitan in both coastal and open ocean regions and include important heterotrophs (*Noctiluca* and *Protoperidinium*) and toxic (*Alexandrium*), or generally harmful species (*Noctiluca*, *Lingulodinium,* and *Ceratium*). Indeed, dinoflagellates are responsible for most of the bioluminescence observed in the surface ocean. Particularly when their populations are dense, disturbance of the water during the night causes bright blue bioluminescent displays that have been reported since at least 500 BC and are known to occur globally. As with all bioluminescence systems, the one present in dinoflagellates is unique from both a cellular and molecular perspective. The production of light occurs in organelles termed scintillons, which contain the luciferin substrate, the luciferase enzyme (LCF) and, in some species, a luciferin binding protein (LBP). Scintillons are dense vesicles approximately 0.5-0.9 µm in diameter and which, during the hours of darkness, are abundant in the periphery of the cell. Light is primarily produced in response to mechanical stimulation due to shear stress, for example upon contact with grazers or by breaking waves. Most bioluminescent dinoflagellates display a diurnal rhythm in bioluminescence intensity, being much brighter in the night than in the day, when it is almost negligible. The function of bioluminescence in dinoflagellates has been less extensively assessed and the theoretical concepts that have been put forward are only supported by limited experimental evidence. Dinoflagellate bioluminescence is proposed to act as defense against predation (recently reviewed by Marcinko *et al.*).

Coelenterates

Numerous coelenterates are known to be luminous. The most typical among them is jellyfish, *Pelagia noctiluca* (Fig. 3) commonly found in the shores of the Mediterranean. *P. noctiluca* is a jellyfish in the family Pelagiidae and the only currently recognized species in its genus. It is typically known in English as the mauve stinger,but other common names are purple-striped jelly (causing potential confusion with *Chrysaora colorata*),purple stinger, purple people eater, purple jellyfish, luminous jellyfish and night-light jellyfish. In Latin, *pelagia* means "of the sea", *nocti* stands for night and *luca* means light; thus, *Pelagia noctiluca* can be described as a marine organism with the ability to glow in the dark (bioluminescence). Light is emitted in the form of flashes when the medusa is stimulated by turbulence created by waves or by a ship's motion. This flashing is only of relatively short duration and gradually fades. Some sea pens emit a bright greenish light; this is known as bioluminescence.

Annelids

Amongst the annelids, bioluminescence is restricted to species of terrestrial oligochaetes and marine polychaetes (Fig. 4). Within the phylum Annelida, bioluminescence is widespread, present in at least 98 terrestrial and marine species that represent 45 genera distributed in thirteen lineages of clitellates and polychaetes. The ecological diversity of luminous annelids is unparalleled, with species occupying a great variety of habitats including both terrestrial and marine ecosystems, from coastal waters to the deep-sea, in benthic and pelagic habitats from polar to tropical regions. This great taxonomic and ecological diversity is matched by the wide array of bioluminescent colors—including yellow light, which is very rare among marine taxa—different emission wavelengths even between species of the same genus, and varying patterns, chemical reactions and kinetics. This diversity of bioluminescence colors and patterns suggests that light production in annelids might be involved in a variety of different functions, including defensive mechanisms like sacrificial lures or aposematic signals, and intraspecific communication systems. In this review, we explore the world of luminous annelids, particularly focusing on the current knowledge regarding their taxonomic and ecological diversity and discussing the putative functions and chemistries of their bioluminescent systems.

Arthropods

Arthropods account with the largest number of luminescent species, most of them found in insects. Some luminescent species are found among millipedes. *Luminodesmus sequoiae* lives in the mountain forests of Sierra Nevada (California), and emit greenish light through the body. Luminescence is produced from the cuticle, legs and antennas. The function of luminescence in millipedes has not yet been studied.

The insects constitute the richest and most diverse group of luminescent species. Harvey (1952), the pioneer in the study of bioluminescence, compiled many reports of luminescence in insects, however, many of them has not been confirmed yet, or were attributed to bacterial infections or ingestion of luminous food. Today, a little more than 2000 luminescent species are described in the orders Collembola (springtails), Diptera (fungus-gnats) and mainly Coleoptera (fireflies, click beetles and railroad worms). Luminescent Collembola species are usually found in the soil. They emit greenish flashes or a more continuous light. Observations suggest that bioluminescence arises from the fat body, but detailed histological as well as biochemical studies are still missing. The biological function of bioluminescence is also unclear. Luminescent species of cockroaches (Orthoptera) were recently found in the Amazon forest. The order of Coleoptera includes most of the bioluminescent species. They are found mainly in the superfamily Elateroidea, which includes fireflies (Lampyridae), railroad worms (Phengodidae) and click beetles (Elateridae). Fireflies (also called lightning bugs) are beetles (Fig. 5). They take from one to two years to mature from larvae, but will live as adults for only about 21 days. While in the larval stage, the insects feed on snails and smaller insects. Once they transform into their adult form, they do not eat.

Their light patterns are part of their mating display. Each species of firefly has a characteristic flash pattern that helps its male and female individuals recognize each other. Most species produce a greenish-yellow light; one species has a bluish light. The males fly and flash and the usually stationary females respond with a flash.

Molluscs

In Mollusca, bioluminescence occurs in a great variety of organisms with distinctly different appearances, such as the classes Gastropoda (limpets, snails and sea hares), Bivalvia (clams), and Cephalopoda (squids and octopuses, Fig. 6). All luminous molluscs presently known are marine organisms, except the New Zealand fresh water limpet *Latia neritoides* and the Malaysian land snail *Quantula* (*Dyakia*) *striata*. In gastropods and bivalves, light is emitted from specialized structures called luminous organs or photophores. The organ contains photogenic cells from which light is generated intracellularly or from which a luminous secretion is elaborated and discharged by the animal.

There are a number of species of bioluminescent squid that make their home in the deep sea. These cephalopods contain light producing photophores over large portions of their bodies. This enables the squid to emit a blue or green light along the length of its body. Other species use symbiotic bacteria to produce light. Squids use bioluminescence to attract prey as they migrate to the surface of the waters undercover of night. Bioluminescence is also used as a type of defense mechanism known as counter-illumination**.** Squids emit light to camouflage themselves from predators that typically hunt by using light variations to detect prey.

Due to bioluminescence, the squid do not cast a shadow in the moonlight making it difficult for predators to detect them. While common in other cephalopods such as squid, bioluminescence does not typically occur in octopuses. The bioluminescent octopus is a deep sea creature with light-producing organs called photophores on its tentacles. The light is emitted from organs that resemble suckers. The blue-green light serves to attract prey and potential mates. The light is also a defense mechanism used to startle predators providing time for the octopus to escape.

Chordates

Bioluminescence among chordate is restricted to protochordates and fishes. Some salp species are bioluminescent and use light to communicate between individuals when linked in vast chains (Fig. 7). Individual salps also use bioluminescence to attract prey and potential mates. Salps are marine animals that resemble jellyfish, but they are actually chordates or animals with a dorsal nerve chord. Shaped like a barrel, these tiny free-swimming animals drift in the ocean individually or form colonies that stretch several feet in length. Salps are filter feeders that feed primarily on phytoplankton, such as diatoms and dinoflagellates. They play an important role in marine ecosystems by controlling phytoplankton blooms.

At least 1,500 species of fish are known to be bioluminescent, including sharks and dragon fishes and scientists regularly discover new ones. Among the most iconic are deep-sea fishes like the anglerfish (Fig. 8).

Anglerfishes are strange looking deep sea fish with sharp teeth. Protruding from the dorsal spine of the females is a bulb of flesh that contains photophores (light-producing glands or organs). This appendage resembles a fishing pole and lure that hangs above the animal's mouth. The luminescent bulb lights up and attracts prey in the dark aquatic environment to the large open mouth of the anglerfish. The lure also serves as a means to attract male anglerfish. Bioluminescence seen in anglerfish is due to the presence of bioluminescent bacteria. These bacteria reside in the glowing bulb and produce the necessary chemicals to emit light. In this mutualistic symbiotic relationship, the bacteria receive protection and a place to live and grow. The anglerfish benefits from the relationship by gaining a means of attracting food. Black dragon fish are monstrous-looking, scale less fish with very sharp, fang-like teeth. They are typically found in deep sea aquatic habitats. These fish have specialized organs known as photophores that produce light. Tiny photophores are located along its body and larger photophores are found below its eyes and in a structure that hangs below its jaw known as barbel. Dragon fish use the glowing barbel to lure fish and other prey. In addition to the production of blue-green light, dragon fish are also capable of emitting red light. Red light helps the dragon fish locate prey in the dark.

Bacteria

Bioluminescent bacteria are all Gram-negative, non-sporeforming and motile (Fig. 9). Luminescent bacteria can be found in different habitats and are widely distributed. They are more commonly found in marine environments than in non-marine environments. There are three major genera for luminous bacteria that have been well studied: *Vibrio, Photobacterium*, and *Xenorhabdus*. Genus *Xenorhabdus* are terrestrial bacteria. Both genus *Vibrio* and *Photobacterium* are marine microorganisms that have a symbiotic relationship with certain marine species. The majority of deep-sea fish are reported to be luminescent, however some luminescent bacteria only exist in a saprophytic or parasitic relationship with

their host. The bio-luminescence of bacteria ensures their survival, persistence, and dispersal as they are able to enter and inhabit other organisms.

In luminescent bacteria, luminescence depends on possessing the lux genes for light production. The Lux operon consists of five essential genes: luxA, luxB, luxC, luxD, and luxE. Light emission in bacteria is catalyzed by luciferase, a heterodimeric enzyme composed of two subunits a and b which are coded by luxA and luxB. Bacterial luciferase reduces the oxygen from surrounding environment while oxidizing a flavin mononucleotide (FMNH2) and a long-chain aliphatic aldehyde (RCHO) to produce the visible light. Synthesis of the long-chain aldehyde is catalyzed by a fatty-acid reductase complex composed of three polypeptides, an NADPH-dependent acyl protein, an acyl transferase and an ATP-dependant synthetase. These three polypeptides are coded by luxC, luxD, and luxE. Bacteria start emitting a steady light in the presence of oxygen when they detect their local population density by quorum sensing. Autoinducers are produced in luminous bacteria and is excreted to the extracellular environment. When autoinducers accumulate in the environment, they can induce the expression of the luxCDABE gene. They produce 100- to 1000- fold more luciferase and light levels increase by 10^3 to 10^6-fold. By inserting a luxCDABE gene in non-luminescent bacteria, researchers can turn the non-luminescent bacteria to the luminescence ones to measure and sense the growth and living condition of bacteria in different environments. This phenomenon can be used in several areas from “detection of pathogenic bacteria in human food sources” to detection of pollutant and toxic waste in the environment. There are two different techniques of using bioluminescent bacteria as a biosensor: ‘lights-on’ and ‘lights-off’. The ‘light-off’ way has been used already for decades for toxicity testing. “Lights-on sensors are usually recombinant microbial cells containing a metal-response unit fused to a promoter less reporter gene encoding for the reporting signal”. These recombinant bacteria express the luminescence encoding genes luxCDABE as a response to presence of heavy metal such as Zn, Cd, and Pb.

Fungi

Bioluminescent fungi emit a green glowing light (Fig. 10). It has been estimated that there are over 70 species of fungi that are bioluminescent. Scientists believe that fungi, such as mushrooms, glow in order to attract insects. Insects are drawn to the mushrooms and crawl around on them, picking up spores. The spores are spread as the insect leaves the mushroom and travels to other locations. Bioluminescence in fungi is controlled by a circadian clock that is regulated by temperature. As the temperature drops when the sun sets, the fungi begin to glow and are easily visible to insects in the dark.

Conclusion

Bioluminescence is not a continuous phenomenon among the luminous organisms, especially animals. It is a good research field for the scientists.

References

http://photobiology.info/Viviani.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-83822003000200001
https://academic.oup.com/icb/article/57/1/18/3861033
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Bioluminescent_Bacteria_in_Human_Settings
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Importance_and_Control_of_Bioluminescence
https://schoolworkhelper.net/bioluminescence-in-fungi-history-mechanism/
https://www.nationalgeographic.com/animals/reference/bioluminescence-animals-ocean-glowing/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5029497/
https://www.nps.gov/grsm/learn/nature/fireflies.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780127514024500145
https://www.thoughtco.com/amazing-bioluminescent-organisms-373898
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789813277113_0007

প্রফেসর (অব.) ড. কে. এন. শাহজাহান করিমের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

ব্যক্তিগত তথ্যাদি

নাম	: কে. এন. শাহজাহান করিম।
পিতা	: মরহুম মো. মোসলেম।
মাতা	: মরহুমা আমেনা খাতুন।
জন্ম	: ১৪ এপ্রিল ১৯৫২ সাল, তৎকালীন সাতক্ষীরা মহকুমা (খুলনা জেলা)।
স্ত্রী	: প্রফেসর (অব.) রাবেয়া খাতুন, উদ্ভিদবিদ।
কন্যা	: সোহানা আফরোজ, চিকিৎসক।
পুত্র	: নাফিস ইমতিয়াজ করিম, রোবট প্রকৌশলী, আমেরিকা প্রবাসী।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি	: দৌলতপুর মুহসীন উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা (১৯৬৭)।
এইচএসসি	: সরকারী বি.এল. কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা (১৯৬৯)।
বিএস-সি (পাস)	: সরকারী বি.এল. কলেজ, খুলনা (সাল ১৯৭১)।
এমএস-সি	: প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় ব্যাচ (শাখা ইকোলজি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫)।
পিএইচ.ডি (কীটতত্ত্ব)	: প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৮); তত্ত্বাবধায়ক: প্রফেসর ড. এম. খালেকুজ্জামান ও ড. বিধান চন্দ্র দাস।

কর্ম জীবন

বিজ্ঞান শিক্ষক	: খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস উচ্চ বিদ্যালয়, অতঃপর থানা মৎস্য কর্মকর্তা (১৯৭৩)।
বিক্রয় প্রতিনিধি	: একটি ঔষধ কোম্পানি (১৯৭৪-৭৫)।
প্রভাষক	: নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী (১৯৭৯)। মোট প্রায় ৮টি সরকারী কলেজে চাকুরী করেছেন, যার মধ্যে কারমাইকেল কলেজ, রংপুর ও রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, অন্যতম।
প্রফেসর ও অধ্যক্ষ	: সরকারী মহিলা কলেজ, রাজশাহী (২০০৩-২০১০)।
পূর্ণ অবসর	: ২০১০।
প্রকাশনা	: পাঠ্য পুস্তক (১০টি), অনুবাদ, সংকলন, শিশুতোষ পুস্তক, কবিতা, ছোট গল্পসহ প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪৫টি, যার মধ্যে কোলকাতা কলেজ স্ট্রীট থেকে ১৮টি। এ ছাড়া, প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ২৫টি।
ফেলো/জীবন সদস্য	: বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি (জীবন সদস্য ও ফেলো), রাজশাহী ডায়াবেটিক সমিতি (জীবন সদস্য), বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি (জীবন সদস্য), রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (জীবন সদস্য)।
সম্মাননা প্রাপ্তি	: বাংলাদেশের প্রায় ১৫টি সংগঠনের সম্মাননা ছাড়াও কোলকাতার পাবলিশার্স বুকগিল্ড-এর সম্মাননা প্রাপ্তি; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত গুণীজন সম্মাননা (২০১৯)।

বি:দ্র: প্রফেসর শাহজাহান করিম রাবি প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ২০১৩ সাল থেকে 'আমেনা-মোসলেম' উপবৃত্তির প্রবর্তক।

অনুলিখন: প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম।

বাংলাদেশে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস

বায়তুন নাহার মৌরী
৪র্থ বর্ষ (সম্মান); রোল: ৯১০১।

সম্প্রতি আমাদের দেশে নতুন একটি ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ভাইরাসটির নাম হল ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস (West Nile Virus)। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞানী, গবেষক ও কর্মকর্তারা বলেছেন ভাইরাসটি বাংলাদেশে নতুন। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (ICDDR, B) একজন ব্যক্তির শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত করেছে। ICDDR,B সরকারিভাবে তিনটি দপ্তরে এই ভাইরাস-এর কথা উল্লেখ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস কাক জাতীয় পাখির দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই ভাইরাসে সংক্রমিত মশা কামড়ালে তা' মানুষে স্থানান্তরিত হয়। এই ভাইরাসের কারণে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আক্রান্ত মানুষের ৮০ শতাংশ-এর মধ্যে রোগের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আক্রান্ত ঘোড়ায় এ রোগের তীব্রতা বেশি দেখা দেয় এবং ঘোড়া মারা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১৯৩৭ সালে আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডার West Nile অঞ্চলের একজন মহিলার শরীরে এই ভাইরাস প্রথম সনাক্ত করা হয়। ১৯৫৩ সালে নীল নদ উপত্যকায় পাখির শরীরে এই ভাইরাস সনাক্ত হয়। গত ৫০ বছরে বিশ্বের অনেক দেশে এই ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় গ্রীস, ইসরাইল, রোমানিয়া, আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এই ভাইরাস আসে ইসরাইল ও তিউনিশিয়া থেকে এবং দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে এ ভাইরাসের প্রকোপ চলতে থাকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময় কেন্দ্র CDC (Centers for Disease Prevention and Control) তাদের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছে যে, রোগটির নির্দিষ্ট কোন টিকা নেই এবং সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসাও নেই। আক্রান্ত প্রতি ৫ জনের মধ্যে একজনের জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা যায়। আক্রান্ত ১৫০ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা তীব্র হয়।

কিভাবে ছড়ায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সংক্রমিত পোষক পাখি বা ঘোড়ার কাছে থেকে বাহক কিউলেক্স মশা ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসটি পায়। কয়েকদিন এর মধ্যে মশার শরীরে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরপর ঐ মশা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীকে কামড়ালে সংক্রমণ ছড়ায়।

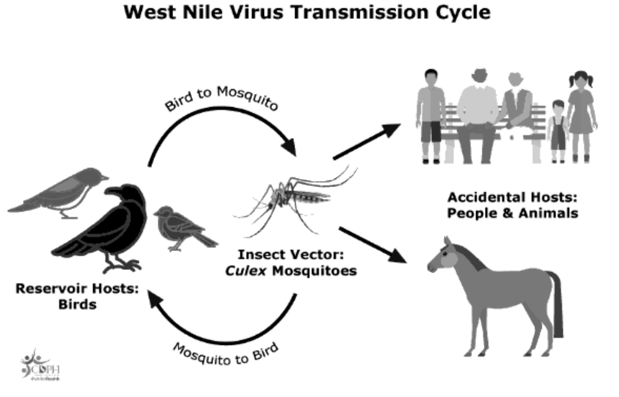

চিত্র: ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসের সঞ্চারণ চক্র।

প্রতিরোধ

মশা নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে এই ভাইরাস প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

লক্ষণ ও সনাক্তকরণ

শতকরা ৮০ শতাংশ মানুষের শরীরে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আক্রান্ত ২০ শতাংশ-এর মধ্যে জ্বর, মাথা ব্যথা, পরিশ্রান্তভাব, বমিভাব, শরীরে ব্যথা, মাঝে মধ্যে শরীরে র‍্যাশ দেখা যায়। এ ছাড়া মানুষ অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। অত্যন্ত ৫ ধরনের পরীক্ষা দ্বারা এই ভাইরাস সনাক্ত করা হয়। তাই, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হল মশা নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষকে সচেতন করা।

তথ্যসূত্র:

প্রবন্ধটির তথ্য ও উপাত্ত ইন্টারনেট উৎস থেকে সংগৃহীত।

মগজখেকো অ্যামিবা

প্রফেসর ড. সারমিন আক্তার

আমরা জানি অ্যামিবা (*Amoeba*) প্রোটোজোয়া পর্বের একটি এককোষী প্রাণী। এককোষী প্রাণীটির কোন কোন প্রজাতি কখনও কখনও মানুষের জন্য প্রাণঘাতী ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে অ্যামিবাজনিত মারণ সংক্রমনের ঘটনা (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের একটি ভিডিও ক্লিপ) সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সম্প্রচারিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে টেক্সাসের আটটি শহরে এই 'মগজখেকো অ্যামিবা' (brain-eating amoeba)-এর ব্যাপারে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। তবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এটি নিয়ে বেশী রকমের 'আতঙ্ক' ছড়ানো হলেও প্রকৃতপক্ষে 'মগজখেকো' অ্যামিবার ঘটনা বিশ্বে এই প্রথম নয়, এবং এটির ঘটনসংখ্যা বা ফ্রিকুয়েন্সি তেমন উদ্বেগজনক নয় বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত। নিচে ব্যাপারটির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

নামকরণঃ 'মগজখেকো অ্যামিবা' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কিন্তু *Amoeba* গণভূক্ত নয়। অ্যামিবার কাছাকাছি নিগ্লেরিয়া (*Naegleria*) গণের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রজাতি, যার আবিস্কারক অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডেলিড শিশু হাসপাতালের প্যাথলোজিস্ট ড. ম্যালকম ফাউলার (Malcolm Fowler)। তাঁর নামানুসারে প্রজাতিটির নাম *Naegleria fowleri* রাখা হয়েছে। ড. ম্যালকম ১৯৬৫ সালে নিগ্লেরিয়াজনিত PAM (primary amoebic meningoencephalitis) বা নেগ্লিরিয়েসিস (naegleriasis) রোগের উপর বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তবে অস্ট্রেলিয়াতে প্রথম সনাক্ত ও আবিস্কৃত হলেও এই জীবনঘাতী প্রজাতিটি আমেরিকায় বিকাশ লাভ করেছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা (Wikipedia)।

শ্রেণীবিন্যাস ও আকার-আকৃতিঃ *N. fowleri* পারকোলোজা (Percolozoa) মাইনর পর্বের অন্তর্ভূক্ত, যেটির শ্রেণী Heterolobosea ও বর্গ Schizopyrenida। *Naegleria* অ্যামিবার কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে মানুষে শুধুমাত্র *N. fowleri* প্রজাতিটিই মগজখেকো রোগটি ঘটায়। এর আবার কয়েকটি সাব-টাইপ রয়েছে, যার সবগুলোই মারাত্মক। জীবন-চক্রের দশার উপর নির্ভর করে এর আকার ৮-১৫ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র ১।

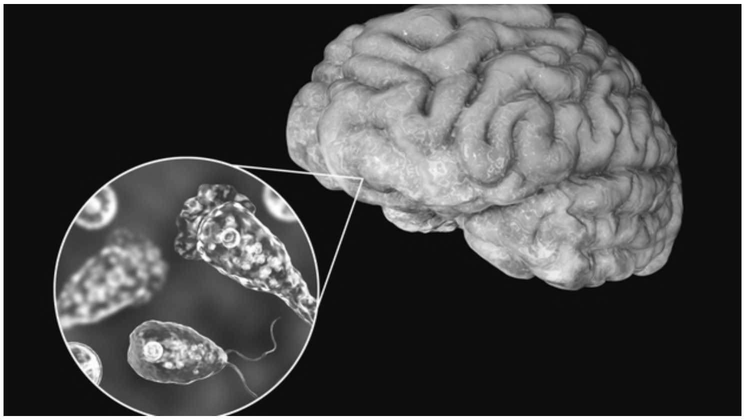

চিত্র ১ঃ মস্তিষ্কের কোষ থেকে নেয়া 'মগজখেকো অ্যামিবা' *Naegleria fowleri* (উৎসঃ Wikipedia)।

কোথায় পাওয়া যায়?ঃ তাপপ্রেমী (thermophilic) এই অ্যামিবা বিশ্বের সব ধরনের উষ্ণ পানির উৎসে বসবাস করতে সক্ষম। এটি ১১৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। পুকুর, হ্রদ, কাদা-মাটি, এমনকি বাসা-বাড়ির ধুলিকণায়, বাগানের মাটি, অ্যাকুয়েরিয়াম, পাওয়ার প্ল্যান্টের বর্জ্য পানি, উষ্ণ প্রস্রবণ, সুইমিং পুল ও স্পা এবং পৌরসভার অপরিশোধিত পানিতে এটি পাওয়া গেছে। তবে, লবণাক্ত পানিতে এটি বেঁচে থাকে না। আমেরিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যসমূহ, বিশেষ করে টেক্সাস ও ফ্লোরিডায় এই অ্যামিবাজনিত আক্রান্তের ঘটনা বেশী জানা গেছে (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)।

জীবন-চক্র: *N. fowleri* একটি মুক্তজীবী ও তাপপ্রেমী প্রজাতি। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কীত। তিনটি আলাদা রূপ বা দশায় এরা থাকতে পারে, যথা: গুটি বা সিস্ট (cyst) , ট্রফোজুয়েট (trophozoite) এবং বাইফ্ল্যাজিলেট (biflagellate)। মানুষে দেহে এদের সিস্ট হিসেবে পাওয়া যায় না; মস্তিষ্কে এরা ট্রফোজুয়েট দশায় এবং সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে বাইফ্ল্যাজিলেট দশায় অবস্থান করে। মস্তিষ্কে এই ট্রফোজুয়েট দশাই স্নায়ুকোষ (neurons) ও অ্যাস্ট্রোসাইট (astrocytes) ধ্বংস করে মৃত্যু ত্বরান্বিত করে থাকে (Wikipedia)।

রোগতত্ত্ব: স্বাভাবিক অবস্থায় প্রজাতিটি পানিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণ করে। আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষে এটি একটি মারাত্মক মারণ ব্যাধি PAM বা নিগ্লেরিয়েসিস ঘটায়। দূষিত পানি নাকের ভিতর দিয়ে প্রথমে ঘ্রাণ স্নায়ুর টিস্যুতে পৌঁছায়, সেখান থেকে সেরেব্রিফর্ম প্লেটের মাধমে জীবাণু মস্তিষ্ক আক্রান্ত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দূষিত পানি পানের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় না। তবে, ক্ষেত্র বিশেষে সুইমিং পুল ও মিউনিসিপ্যালের সরবরাহকৃত পানি থেকেও এই রোগ ছড়ানোর তথ্য রয়েছে। তবে মজার বিষয় হলো *N. fowleri* -তে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মধ্যে এটি ছড়াতে পারে না। আমেরিকায় ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৩৪ জন ব্যক্তির আক্রান্তের তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও গবেষণাগারে অন্যান্য প্রাণী যেমন: ইঁদুর, গিনিপিগ, ট্যাপির, গরু এবং ভেড়ায় এই রোগের সংক্রমণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে (CDC)।

নাকের মধ্য দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশের ২-১৫ দিনের মধ্যে মগজখেকো অ্যামিবাজনিত অসুখের নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়, যার বেশীর ভাগই ব্যাকটেরিয়াজনিত মেনিনজাইটিস (bacterial meningitis)-এর মত ঃ (ক) খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধের পরিবর্তন; (খ) জ্বর; (গ) হঠাৎ প্রচন্ড মাথা ব্যথা; (ঘ) ঘাড়ের মাশপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া (stiff neck), (ঙ) আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা; (চ) বমি ও নিদ্রাভাব; (ছ) শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়া; (জ) বিভ্রান্তি ও খিঁচুনি ইত্যাদি। লক্ষণগুলো প্রকাশের ৩-৭ দিনের মধ্যে সাধারণত রোগীর মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত রোগী বেঁচে যাওয়ার ঘটনা পৃথিবীব্যাপী এ পর্যন্ত হাতে গোনা মাত্র কয়েকটির সংবাদ পাওয়া গেছে (WebMD)।

চিকিৎসা: মগজখেকো অ্যামিবার বিরুদ্ধে চিকিৎসাসেবা এখনও সন্তোষজনক নয়। তবে খুশির খবর হলো এন্টিফাংগাল ড্রাগ অ্যাম্ফোটেরিসিন-বি (Amphotericin-B) ব্যবহার করে প্রায় ৫% রোগীর মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার: *N. fowleri* প্রকৃতিতে সচরাচর দেখা গেলেও PAM বা নিগ্লেরিয়েসিস কিন্তু একটি দুষ্প্রাপ্য রোগ, যা সাধারণত আমেরিকায় বছরে সর্বোচ্চ আট বার এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এটি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ঘটতে দেখা গেছে। তবে বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অ্যামিবার সংস্পর্শে এলেও কেন যে শুধুমাত্র নগণ্যসংখ্যক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে এটির ব্যাখ্যা এখনও পরিষ্কার নয়। যেহেতু পানিতে সাঁতার কাটা কিংবা খেলাধুলার সময় মানুষ এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে, সেহেতু বিশেষজ্ঞগণ উষ্ণ পানির উৎস পরিহার এবং পানিতে সাঁতার কিংবা খেলার সময় নাকে ক্লিপ (nose clip) ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন (Mayoclinic.org)।

তথ্যসূত্র:

https://en.wikipedia.org/wiki/Naegleria_fowleri
https://www.cdc.gov/parasites/naegleria/index.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/naegleria-infection/symptoms-causes/syc-20375470
https://www.webmd.com/brain/brain-eating-amoeba#1

তথ্য সংযোজন ও অনুলিখন: প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম।

রদবদল প্রকৃতিতে এবং আগামীর দিনগুলো

ফারহীন তামান্না তিথী
২য় বর্ষ (সম্মান); রোল: ৯১৪৪।

প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হওয়া এ পৃথিবীটা কেমন আছে আজ? সভ্যতা, সংস্কৃতি কিংবা প্রকৃতির দিক দিয়ে! কালের বিবর্তনে বিবর্তিত হয়ে চলমান এই সময়ে দাঁড়িয়ে এক এক উৎসুক মনে উদ্ভাবিত হওয়া এক এক প্রশ্ন। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত যত পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানী এসেছেন, তারা বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে। শত শত নির্ঘুম রাতের কর্মফল উপহার দিয়েছেন পৃথিবীকে। সভ্যতা, সংস্কৃতির উন্নতি আর অদলবদল হয়েছে অনেক। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বলা যেতেই পারে, সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। তবে যে প্রসঙ্গে সামনে এগুতে চাই তা হলো "প্রকৃতি"। বিস্তৃতি (জল, স্থল, বায়ুমন্ডল), সতেজতা আর প্রাণ (উদ্ভিদ, প্রাণী) মিলিয়ে যে নৈসর্গ, অন্য নামে তাকে প্রকৃতি বলি। পৃথিবী নামক সুবিস্তৃত এ ভূখণ্ডে যত প্রাণ রয়েছে শুরু করতে চাই তা থেকেই। এক কোষী থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এর সমন্বয়ে গঠিত উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী যা যোগ্যতার লড়াইয়ে টিকে রয়েছে এখনো, তাদের "অভিনন্দন"।

কারণটা বলছি পরে। ফিরে যাচ্ছি ১০-১৩ বছর আগের ছোটবেলায়। শহর হতে গ্রামের পরিবেশ সদা সর্বদা প্রাণবন্ত আর উচ্ছাস উল্লাসে মুখরিত হয়ে থাকে সে কথা সকলের জানা। অনিয়ম আর নির্বাধে কালবৈশাখীর মতো বেড়ে ওঠা ছোটবেলা। যেখানে ব্যস্ততা, বাস্তবতা, নিষ্ঠুরতা কিংবা ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না, আমার ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা, বাড়ি ছিল মাঠ-ঘাট আর চাল ছিল ব্যপ্ত আকাশ। মা কখনো সন্ধ্যায় বলেননি, "বাইরে খেলিস না, গুড নাইট রোল অন বা অডোমোস অ্যান্টি মসকিটো (Anti mosquito) ক্রীম লাগা।" গ্রীষ্মের ঝড়ে আম কুড়াতে গেলে বাবা রেগে ধমকিয়ে বলেননি, "বাজ পড়বে যাস না।" কারণ স্পষ্ট। অথচ আমার ছোটবেলা এখন হলে সে বৃষ্টির আস্বাদন, ভিজে গায়ে থর-থর কেঁপে আম পড়ার অপেক্ষায় বাড়ির পিছনে চালের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা ফুটবল হাতে সদ্য কাটা ধানের জমিতে দৌড় দেওয়া হতো না। সন্ধ্যা নামার মুখে সরষে জমিতে লুকোচুরি অথবা ফাঁকা বরই গাছতলায় বরই চুরি করা হতো না। এখন, যেখানে বড় গাছ-পালা কম, প্রতি বছর শত থেকে শতাধিকের বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে বাজ পরে। মশা ও তার লার্ভকে প্রাকৃতিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, ব্যাঙ সহ অন্যান্য প্রাণী এখন প্রকৃতিতে অপ্রতুল। বাধা ধরা নিয়ম আর বাস্তব সত্য প্রকৃতির অগ্নি রুপে বড় বেলা যখন এমন! ছোটবেলায় মানসিক সে তুষ্টি যদি না পেতাম তাহলে আত্মা নামক বস্তুটি আমায় সারাজীবন দোষারোপ করে যেত। নতুন, পুরাতন কিংবা পুরাতনের নতুনভাবে আবির্ভাব হওয়া রোগে এখন আমরা ভীত। আজ কিংবা আজ হতে ৫০ বছর পর দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হওয়া এ নিসর্গে কোথায় পাব অক্সিজেন, আবাস, জীবাশ্ম, কি হবে নিম্নাঞ্চলের কিংবা রোগবালাই দূর্যোগের!? এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে ফিরে আসে বারংবার। উত্তর যত সহজে দেওয়া যায় ততটা সহজে তা মানা যায় না। মানতে চাইনা।

বন উজাড়, প্রাণীর আবাস নষ্ট, বন্য প্রাণী শিকার ও পাচার, মাত্রারিক্ত কীটনাশক, বাস্তুতন্ত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিটি প্রাণের প্রতি অবিচার অত্যাচার চালানো, নামে উৎকৃষ্ট *Homo sapiens* আজ কাজের মাধ্যমে তার নিকৃষ্টতার প্রমাণ দিচ্ছে। অধিকার ছাড়া প্রকৃতি ধ্বংস করার মনোভাবে থাকা এই প্রাণীদেরকে প্রকৃতি আভাস দিচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত গরম, ঠান্ডা, ঝড় কিংবা জলোচ্ছাসের মধ্য দিয়ে।

কথায় আছে, "যে যতটা সুন্দর শান্ত তার অসুন্দর আর ক্ষিপ্ত রূপ নাকি ততটা ভয়ংকর।" শান্ত সফেন সমুদ্র, সবুজ নিসর্গ, দক্ষিণা মৃদু হাওয়া কিংবা স্থবির পাহাড়, উপমায় তাদের সৌন্দর্য যতটা প্রকাশ করা যায় তার থেকে ও বিভীষিকাময় হতে পারে তাদের ক্ষিপ্ত রূপ। সৃষ্টির আদি থেকে যখন দূর্যোগ আর বিপরীতে বওয়া পরিস্থিতিতে খাদ্য, আবাস প্রজননের তাগিদে স্ব-জাতিকে খেয়ে (cannibalism) তৃপ্ত তখন শুধু সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চটা দিয়ে টিকে থেকে এই একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা আর সংস্কৃতি দেখতে পাওয়াটাই তো অনেক! তাই উন্নত এই সভ্যতা গড়ে তুলতে গিয়ে *Homo sapiens* এর নির্মমতা, প্রকৃতির নিষ্ঠুর কিছু নিয়মকে উপেক্ষা করে যারা এখনো টিকে আছে "অভিনন্দন" তো তাদের-ই প্রাপ্য! আর তখনই বিখ্যাত লেখক Max Lucado এর কালজয়ী উক্তিটি মনে পড়ে "You are valuable because you exist, not because of what you do or what you have done, but simply because you are." ভূখণ্ডে প্রাণ তো টিকে আছেই। তবে শ্রেষ্ঠত্বে খ্যাত আমরা কতদিন টিকে থাকবো, যদি এমনি বর্বরতা চালিয়ে যাই?

আবারো সে সমাধান- সব কিছুতে অন্যায়, অবিচার, অধিকার না খাটাই। সুন্দর এই পরিবেশে একটি ময়লা ফেলতেও যেন ভাবি। একটি গাছ কাটলে তার কয়েক গুণ বেশি রোপন করি। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াই। প্রকৃতিকে তার নিয়মে চলতে সাহায্য করি যেন আগামীর নতুন প্রজন্ম নৈসর্গিক এ সৃষ্টিকে তার সৌন্দর্যের উপমায় দেখতে পায়। প্রাণ, প্রাণী আর এ বৈচিত্র্যতা চির অমলিন থাকুক। সার্থক হোক এ প্রাণভিত্তিক অধ্যয়ন।

প্রবন্ধটির তথ্য ও উপাত্ত ইন্টারনেট উৎস থেকে সংগৃহীত।

রহস্যময়ী বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল

ফয়সাল রাহাত
৪র্থ বর্ষ (সম্মান); রোল: ৯১১৪।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল (Bermuda’s Triangle) শব্দটার সাথে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের না। দিনটি ছিলো ২২ আগস্ট ২০১৭। আমরা তিন বন্ধু আমি, রায়হান ও রুহুল শহীদ হবিবুর রহমান হলের সামনে ফার্মেসি বিভাগের গবেষণা মাঠের মধ্যে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। গল্পে গল্পে রুহুলের মুখ থেকেই নামটা প্রথম জানতে পারি। এ সম্পর্কে কিছু ভয়ানক কাহিনীও জানতে পেরেছিলাম। আটলান্টিক মহাসাগরের নিচেই নাকি কোনো একটা গুহা আছে, যেখানে সব রকম বড় বড় জাহাজগুলো হারিয়ে যায়। চুম্বকীয় কোনো শক্তি আছে, যা আকাশে উড্ডুক্কু বিশাল আকারের বিমানকে টেনে নিয়ে যায় সাগরের গভীরে। বাড়তে শুরু করলো জানার কৌতুহল। রুমে ফিরেই ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম, গুগলে সার্চ দিলাম 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল রহস্য' লিখে। স্ক্রিনে ভেসে উঠল কিছু কাল্পনিক দৃশ্য 'নদীর ভেতর থেকে কোন এক মহাদানব উঠে এসে আকাশে উড়ন্ত বিমানকে টেনে আনছে পানিতে, হঠাৎ করে মাঝ সাগরে জলরাশি ফুঁসে উঠে গ্রাস করছে বিশাল আকৃতির সব জাহাজগুলোকে! এ সব দেখে জানার ইচ্ছা আরো প্রবল হলো। মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করলো, এতো সব কী তাহলে সত্যিই ঘটে? চলুন দেখা যাক, এ সবের স্বপক্ষে-বিপক্ষে কি প্রমান আছে আমাদের হাতে।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও এর বিস্তৃতি

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল বা বারমুডা ত্রিভুজটা আসলে কী? বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল হলো আটলান্টিক মহাসাগরের তিন প্রান্ত দিয়ে সীমাবদ্ধ ত্রিভুজাকৃতির একটি বিশেষ এলাকা (চিত্র ১) যেখানে বহু জাহাজ ও বিমান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার কথা বলা হয়। তবে এর কুখ্যাতির জন্য একে ‘শয়তানের ত্রিভুজ’ও বলা হয়। বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের বিস্তৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল যে তিনটি প্রান্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ তার এক প্রান্তে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা আর এক প্রান্তে পুয়ের্তো রিকো এবং অপর প্রান্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বারমুডা দ্বীপ অবস্থিত। কেউ মনে করেন এর আকার ট্রাপিজয়েডের মত, যা ছড়িয়ে আছে ফ্লোরিডা, বাহামা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইশোর পূর্বদিকের আটলান্টিক অঞ্চল জুড়ে, আবার কেউ কেউ এগুলোর সাথে মেক্সিকো উপসাগরকেও যুক্ত করেন। তবে লিখিত বর্ণনায় যে সাধারণ অঞ্চলের ছবি ফুটে ওঠে, তাতে রয়েছে ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূল, পুয়ের্তো রিকো, মধ্য আটলান্টিকে বারমুডার দ্বীপপুঞ্জ এবং বাহামা ও ফ্লোরিডা স্ট্রেইটস্-এর দক্ষিণ সীমানা, যেখানে ঘটেছে অধিকাংশ দূর্ঘটনা।

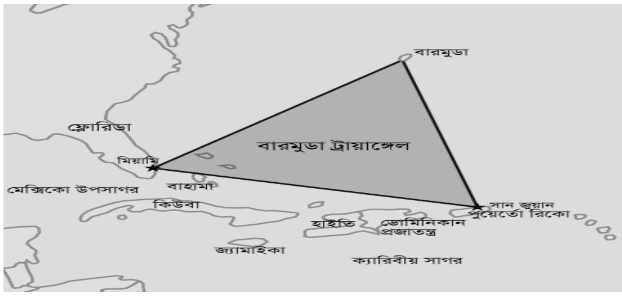

চিত্র ১: পশ্চিম আটলান্টিক অঞ্চলে অবস্থিত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলকে ঘিরে যত রহস্য

এই অঞ্চলের রহস্যের মূল কারণ হল এখানে কোনো জাহাজ বা বিমান একবার প্রবেশ করার পরই তার বেতার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, দিক নির্দেশক কম্পাস ভুল দিক নির্দেশ করতে থাকে। এক সময় জাহাজটি বা বিমানটি অদৃশ্য হয়ে যায়। যে জাহাজ বা বিমান একবার এর মধ্যে ঢুকেছে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসবই যুগের পর যুগ ধরে মিথ হয়ে রয়েছে এই রহস্যময় অঞ্চলকে ঘিরে (চিত্র ২ ও ৩)। আর তাই একে ঘিরে তৈরি হয়েছে একের পর এক গল্প। কখনও শত্রু পক্ষের আক্রমণের গল্প করা হয়েছে, আবার কখনও এমনকী ভিনগ্রহের বাসিন্দাদেরও এই ঘটনার নেপথ্যে থাকার জন্য দায়ী করা হয়েছে। এই ত্রিভুজের উপর দিয়ে মেক্সিকো উপসাগর থেকে উষ্ণ সমুদ্র স্রোত বয়ে গেছে। এই তীব্র গতির স্রোতই মূলত অধিকাংশ অন্তর্ধানের কারণ। এখানকার আবহাওয়া এমন যে হঠাৎ করে ঝড় ওঠে আবার থেমে যায়, গ্রীষ্মে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। বিংশ শতাব্দীতে টেলিযোগাযোগ, রাডার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি পৌঁছানোর আগে এমন অঞ্চলে জাহাজডুবি একটি স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

চিত্র ২: বারমুডা ট্রায়াঙ্গল-এ সংঘটিত দুটি কাল্পনিক দৃশ্য।

চিত্র ৩: বায়ুর ঘূর্ণি সমুদ্রের উপরে আছড়ে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর কাল্পনিক দৃশ্য। **চিত্র ৪:** মার্কিন বিমান বাহিনীর TBF Trumman Avenger Flight যা দেখতে অনেকটা ফ্লাইট নাইনটিন-এর মত; তাই অনেক লেখক এই ছবিকে ফ্লাইট নাইনটিন বলে চালিয়েছেন।

এই অঞ্চলের গুরুত্ব কী?

এই অঞ্চল বিশ্বের ভারী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলকারী পথগুলোর অন্যতম। জাহাজগুলো আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করে। এছাড়াও এটি হল প্রচুর প্রমোদতরীর বিচরণ ক্ষেত্র। এ অঞ্চলের আকাশপথে বিভিন্ন রুটে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিমান চলাচল করে।

ত্রিভুজ গল্পের ইতিহাস

একটি ধারণা সবার মধ্যে প্রচলিত আছে যে, বহিঃর্বিশ্বের কোনো অজানা প্রাণীর বাস সেখানে, যারা সর্বদা বসে আছে আশেপাশের সবকিছু গ্রাস করে নেবার জন্য। ধারণা মতে ভিনগ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে এসে এ স্থানটিকে তাদের ঘাঁটি বানিয়ে এ অঞ্চলের ভিতরে প্রবেশকারী সকল কিছুর চিহ্ন তারা গায়েব করে দেয় যাতে কেউ তাদের ব্যাপারে কিছুই জানতে না পারে। মজার বিষয়, এই জায়গাটিকে তুলনা করা যেতে পারে ব্ল্যাকহোলের সাথে যেখানে একবার কেউ প্রবেশ করলে বের হওয়া তো দূরের কথা তার কোনো অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম এই জায়গাটি আবিষ্কার করেন আমেরিকার উদ্ভাবক কলম্বাস। তার বর্ণনামতে, তার জাহাজের নাবিকেরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল পাড়ি দেবার সময় দেখেছিল আলোর নাচানাচি আর আকাশে ধোঁয়া। এছাড়া কলম্বাস আরো লিখেছেন যে এই জায়গায় এসে তার কম্পাসও ভুল নির্দেশনা দিচ্ছিলো। তিনি ১১ই অক্টোবর, ১৪৯২ তে তাঁর লগ বুকে লিখেন-

"The land was first seen by a sailor (Rodrigo de Triana), although the Admiral at ten o'clock that evening standing on the quarter-deck saw a light, but so small a body that he could not affirm it to be land; calling to Pero Gutiérrez, groom of the King's wardrobe, he told him he saw a light, and bid him look that way, which he did and saw it; he did the same to Rodrigo Sánchez of Segovia, whom the King and Queen had sent with the squadron as comptroller, but he was unable to see it from his situation. The Admiral again perceived it once or twice, appearing like the light of a wax candle moving up and down, which some thought an indication of land. But the Admiral held it for certain that land was near..."

বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা প্রকৃত লগবুক পরীক্ষা করে যে মত দিয়েছেন তার সারমর্ম হল, নাবিকেরা যে আলো দেখেছেন তা হল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত নৌকায় রান্নার কাজে ব্যবহৃত আগুন, আর কম্পাসে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ১৯৫০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ই. ভি. ডব্লিউ. জোন্স (E.V.W. Jones) সর্বপ্রথম এ ত্রিভুজ নিয়ে খবরের

কাগজে লেখেন। এর দু বছর পর ফেইট (Fate) ম্যাগাজিনে জর্জ এক্স. স্যান্ড (George X. Sand) সী মিস্ট্রি এট আওয়ার ব্যাক ডোর (Sea Mystery At Our Back Door) শিরোনামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেন। এ প্রবন্ধে তিনি ফ্লাইট নাইনটিন এর নিরুদ্দেশের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং তিনিই প্রথম এই অপরিচিত ত্রিভুজাকার অঞ্চলের কথা সবার সামনে তুলে ধরেন।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে ফ্লাইট নাইনটিন নিপড আমেরিকান লিজান (American Legion) ম্যাগাজিনে লেখা হয় যে, এই ফ্লাইটের দলপতিকে নাকি বলতে শোনা গিয়েছে- We don't know where we are, the water is green, no white অর্থাৎ 'আমরা কোথায় আছি জানি না, সবুজ বর্ণের জল, কোথাও সাদা কিছু নেই'। এতেই প্রথম ফ্লাইট নাইনটিনকে কোন অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সাথে যুক্ত করা হয়। এরপর ভিনসেন্ট গডিস (Vincent Gaddis) প্রাণঘাতী বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল (The Deadly Bermuda Triangle) নামে আর এক কাহিনী ফাঁদেন ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি আরও বিস্তর বর্ণনা সহকারে ইনভিজিবল হরাইজন (Invisible Horizons) নামের একটি বই লেখেন।

এবার বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কীত তিনটি আলোচিত ঘটনা নিচে বিবৃত হলো ঃ

ফ্লাইট নাইনটিন

ফ্লাইট নাইনটিন (Flight 19), পাঁচটি টিবিএফ আভেঞ্জার টর্পেডো বোমারু বিমানের একটি, যেটি প্রশিক্ষণ চলাকালে ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর আটলান্টিক মহাসাগরে নিখোঁজ হয় (চিত্র ৪)। বিমানবাহিনীর ফ্লাইট পরিকল্পনা ছিল ফোর্ট লডারদেল থেকে ১৪৫ মাইল পূর্বে এবং ৭৩ মাইল উত্তরে গিয়ে, ১৪০ মাইল ফিরে এসে প্রশিক্ষণ শেষ করা। বিমানটি আর ফিরে আসেনি। নেভি তদন্তকারীরা নেভিগেশন ভুলের কারণে বিমানের জ্বালানীশূন্যতাকে বিমান নিখোঁজের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। বিমানটি অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য পাঠানো বিমানের মধ্যে একটি বিমান পিবিএম ম্যারিনার ১৩ জন ক্রুসহ নিখোঁজ হয়, এটির প্রমান হিসেবে ফ্লোরিডা উপকূলে থাকা একটি ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের ফলে ব্যাপক তেল দেখার কথা বলে কিন্তু উদ্ধার অভিযানে এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনা শেষে আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠে। সূত্র মতে, সমসাময়িককালে বাষ্প লিকের কারণে জ্বালানী ভর্তি অবস্থায় বিমানটির বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

ইউএসএস সাইক্লপস্

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-ইতিহাসে যুদ্ধ ছাড়া সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ইউএসএস সাইক্লোপস্ (USS Cyclops) নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। অতিরিক্ত ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ভর্তি বিমানটি ১৯১৮ সালের ৪ মার্চ বার্বাডোস দ্বীপ থেকে উড্ডয়নের পর একটি ইঞ্জিন বিকল হয় এবং ক্রুসহ ৩০৯ জন নিখোঁজ হয়। যদিও কোন শক্ত প্রমাণ নেই তবুও অনেক কাহিনী শোনা যায়। কারও মতে ঝড় দায়ী, কারও মতে ডুবে গেছে আবার কেউ এই ক্ষতির জন্য শত্রুপক্ষকে দায়ী করে। উপরন্তু, সাইক্লোপস-এর মত আরও দু'টি ছোট জাহাজ প্রোটিউস এবং নেরেউস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে নিখোঁজ হয়। সাইক্লোপসের মত এই জাহাজ দুটিও অতিরিক্ত আকরিকে ভর্তি ছিল। তিনটি ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত মালামাল ধারণে অক্ষমতার (ডিজাইনগত) কারণেই জাহাজডুবি হয় বলেই ব্যাপক ধারণা করা হয়।

ডগলাস ডিসি-৩

২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে একটি ডগলাস ডিসি-৩ (Douglas DC-3), ফ্লাইট নাম্বার NC16002, সান জুয়ান, পুয়ের্তো রিকো থেকে মিয়ামি যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়। বিমানে থাকা ৩২ জন লোকসহ বিমানটির কোন হদিস পাওয়া যায়নি। সিভিল এরোনটিক্স বোর্ড তদন্তের নথিপত্র থেকে বিমানটি নিখোঁজ হওয়ার সম্ভাব্য একটি কারণ পাওয়া যায়, সেটি হল- বিমানের ব্যাটারি ঠিকমত চার্জ না করে পাইলট সান জুয়ান থেকে রওনা দেয়। কিন্তু এটা সত্যি কিনা তা' জানা যায় নি।

প্রকৃত ঘটনা কী হতে পারে? এবার চলুন বিশিষ্ট্যজনদের রহস্যময় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ঘিরে কিছু ব্যাখ্যা/তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যাক।

১। ষড়ভূজী মেঘ

সম্প্রতি ব্রিটিশ দৈনিক ডেইলি মেলে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, চূড়ান্ত আবহাওয়ার কারণে এই অঞ্চলে ষড়ভূজ মেঘের উৎপত্তি ও গঠনই জাহাজ ও বিমানের গায়েব হওয়ার পিছনে দায়ী। বলা হচ্ছে, এই অঞ্চলে এই ষড়ভূজী মেঘ এমনভাবে জমাট বাঁধছে যে তার ফলে 'বায়ু বোমা' তৈরি হচ্ছে। যার ফলে বাতাসের গতি বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৭০ মাইল বা ২৭৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। যার ক্ষমতা রয়েছে জলে ভাসা বড় জাহাজ অথবা আকাশে ওড়া বিমানকে সমুদ্রের বুকে টেনে আনার। এই ধরনের বায়ুর ঘুর্ণি সমুদ্রের উপরে আছড়ে পড়ে বিস্ফোরণ করে (চিত্র ৩), ফলে তুমুল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় যা এই অঞ্চলকে অশান্ত করে তোলে, এমনটাই জানানো হয়েছে রিপোর্টে।

২। প্রাকৃতিক ঘটনা

কন্টিনেন্টাল সেলভ্‌স (Continental shelves)-এ জমে থাকা বিপুল পরিমাণ মিথেন হাইড্রেট অনেক জাহাজ ডোবার কারণ বলে মনে করা হয় (চিত্র ৫)। অস্ট্রেলিয়ার পরীক্ষাগারের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাতাসের বুদ্‌বুদ্ পানির ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। তাই সাগরে যখন পর্যায়ক্রমিকভাবে মিথেন হাইড্রেট গ্যাস উদগীরণ হয়, তখন পানির প্লাবতা (কোন কিছুকে ভাসিয়ে রাখার ক্ষমতা) কমে যায়। যদি এমন ঘটনা ঐ এলাকায় ঘটে থাকে, তবে সতর্ক হবার আগেই কোন জাহাজ দ্রুত ডুবে যেতে পারে। তবে, ১৯৮১ সালে USGS (ইউনাইটেড স্টেটস্ জিওলজিক্যাল সার্ভে) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যাতে বর্ণিত আছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলের বিপরীতে ব্ল্যাক রিজ (Black Ridge) এলাকায় মিথেন হাইড্রেট রয়েছে। কিন্তু USGS-এর ওয়েবপেজ থেকে জানা যায়, গত ১৫০০ বছরের মধ্যে ঐ এলাকায় মিথেন হাইড্রেট গ্যাসের উদ্‌গীরণ তেমন ঘটেনি।

চিত্র ৫: ১৯৯৬ সালের একটি মানচিত্রে দেখানো হয়েছে বিশ্বের যেসব স্থানে মিথেন হাইড্রেট গ্যাস যুক্ত পলি পাওয়া গিয়েছে অথবা পলি আছে বলে অনুমান করা হয়।

৩। কম্পাসের ভুল দিক নির্দেশনা

কম্পাসের পাঠ নিয়ে বিভ্রান্তির অনেকাংশে এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কাহিনীর সাথে জড়িত। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে কম্পাস থেকে চুম্বক মেরুর দূরত্বের উপর ভিত্তি করে এর দিক নির্দেশনায় বিচ্যুতি আসে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র উইসকনসিন (Wisconsin) থেকে মেক্সিকোর উপসাগর (Gulf of Mexico) পর্যন্ত সরলরেখা বরাবর চৌম্বক উত্তর মেরু সঠিক ভাবে ভৌগোলিক উত্তর মেরু নির্দেশ করে। এই সাধারণ তথ্য যে কোন দক্ষ পথপ্রদর্শকের জানা থাকার কথা। কিন্তু সমস্যা হল সাধারণ মানুষকে নিয়ে, যারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। ঐ ত্রিভুজ এলাকা জুড়ে কম্পাসের এমন বিচ্যুতি তাদের কাছে রহস্যময় মনে হয়। কিন্তু এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

৪। হারিকেন

হারিকেন (Hurricane) হল শক্তিশালী ঝড়। ঐতিহাসিক ভাবেই জানা যায় আটলান্টিক মহাসাগরে বিষুব রেখার কাছাকাছি অঞ্চলে শক্তিশালী হারিকেনের কারণে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানী ঘটেছে, আর ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকার। রেকর্ড অনুসারে ১৫২০ সালে স্প্যানিশ নৌবহর “ফ্রান্সিসকো দ্য বোবাডিলা” (Francisco de Bobadilla) এমনি একটি বিধ্বংসী হারিকেনের কবলে পড়ে ডুবে যায়। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কাহিনীর সাথে জড়িত অনেক ঘটনার জন্য এধরনের হারিকেনকেই দায়ী করা হয়।

৫। গলফ্ স্ট্রিম

গলফ্ স্ট্রিম হল মেক্সিকো উপসাগর থেকে স্ট্রেইটস অব ফ্লোরিডা (Straits of Florida) হয়ে উত্তর আটলান্টিকের দিকে প্রবাহিত উষ্ণ সমুদ্রস্রোত। একে বলা যায় মহাসমুদ্রের মাঝে এক নদী। নদীর স্রোতের মত গলফ্ স্ট্রিম ভাসমান বস্তুকে স্রোতের দিকে ভাসিয়ে নিতে পারে। যেমনি ঘটেছিল ১৯৬৭ সালের ২২ ডিসেম্বর উইচক্রাফট (Witch craft) নামের একটি প্রমোদ তরীতে। মিয়ামি তীর হতে এক মাইল দূরে এর ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিলে তার নাবিকরা তাদের অবস্থান কোস্ট গার্ডকে জানায়। কিন্তু কোস্ট গার্ডরা গিয়ে তাদেরকে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পায়নি।

৬। মানবঘটিত দুর্ঘটনা

অনেক জাহাজ এবং বিমান নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার তদন্তে দেখা গিয়েছে এর অধিকাংশই চালকের ভুলের কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। মানুষের ভুল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, আর এমনি ভুলের কারণে দুর্ঘটনা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলেও ঘটতে পারে। যেমন কোস্ট গার্ড ১৯৭২ সালে ভিএ ফগ (VA Fog)-এর নিখোঁজ হবার কারণ হিসেবে বেনজিন এর পরিত্যাক্ত অংশ

অপসারণের জন্য দক্ষ শ্রমিকের অভাবকে দায়ী করেছে। সম্ভবত ব্যবসায়ী হার্ভি কনোভার (Harvey Conover) তাঁর অসাবধানতার কারণেই নিখোঁজ হন। অনেক নিখোঁজের ঘটনারই উপসংহারে পৌঁছানো যায়নি, কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাদের কোন ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৭। ইচ্ছাকৃত ধ্বংস সাধন

যুদ্ধের সময় অনেক জাহাজ শত্রু পক্ষের অতর্কিত আক্রমণে ডুবে গিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। এ কারণেও জাহাজ নিখোঁজ হতে পারে। তবে বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু জাহাজ, যাদের মনে করা হয় এমনি কারণে ডুবেছে, তাদের উপর অনুসন্ধান করা হয়। তবে শত্রু পক্ষের নথিপত্র, নির্দেশনার লগ বই ইত্যাদি পরীক্ষা করে তেমন কিছু প্রমান করা যায়নি। যেমন- মনে করা হয় ১৯১৮ সালে ইউএসএস সাইক্লপস্ (USS Cyclops) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সিস্টার শিপ প্রোটিয়াস (Proteus) এবং নিরিয়াস (Nereus) কে জার্মান সেনারা ডুবোজাহাজ ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে জার্মান রেকর্ড থেকে তার সত্যতা প্রমাণ করা যায়নি।

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা ছাড়াও কিছু ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন, ধারণা করা হয় যে, জলদস্যুদের আক্রমণে অনেক জাহাজ নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারে। সে সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে এবং ভারত মহাসাগরে মালবাহী জাহাজ চুরি খুব সাধারণ ঘটনা ছিল। মাদক চোরাচালানকারীরা সুবিধা মত জাহাজ, নৌকা, ইয়ট ইত্যাদি চুরি করত মাদক চোরাচালানের জন্য। ১৫৬০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ছিল জলদস্যুদের আখড়া। কুখ্যাত জলদস্যু 'ব্ল্যাক বেয়ার্ড' এডওয়ার্ড টিচ (Edward Teach) এবং জিন লাফিতি (Jean Lafitte) ছিল ঐ অঞ্চলের বিভীষিকা। তবে শোনা যায় জিন লাফিতি-ই নাকি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের শিকার হয়েছিল।

আর এক ধরনের দস্যুতার কথা শোনা যায়, যা পরিচালিত হত স্থল থেকে। এ ধরনের দস্যুরা সমুদ্রের ধারে রাতে আলো জ্বালিয়ে জাহাজের নাবিকদের বিভ্রান্ত করত। নাবিকরা ঐ আলোকে বাতি ঘরের আলো মনে করে সেদিকে অগ্রসর হত। তখন জাহাজগুলি ডুবো পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষে ডুবে যেত। তারপর ডোবা জাহাজের মালপত্র তীরের দিকে ভেসে এলে দস্যুরা তা সংগ্রহ করত। হয়তো ডুবন্ত জাহাজে কোন নাবিক বেঁচে থাকলে দস্যুরা তাদেরকেও হত্যা করত।

যদিও আজ অব্দি অনেক গবেষণা হয়েছে এই ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে, তারপরও গবেষণার শীর্ষে স্থান দেওয়া হচ্ছে 'ষড়ভূজ মেঘের উৎপত্তি ও গঠন' তত্বটিকে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে সঠিক গবেষণার মাধ্যমে বের হয়ে আসবে আরো নতুন কিছু অজানা রহস্য, যার ফলশ্রুতিতে হয়তো বাঁচানো যাবে অসংখ্য নিরীহ প্রাণ।

প্রথম দিকেই আমরা দেখেছি যে, এই অঞ্চল বিশ্বের ভারী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলকারী পথগুলোর অন্যতম। জাহাজগুলো আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করে। এ ছাড়া এটি হল প্রচুর প্রমোদতরীর একটি বিচরণ ক্ষেত্র। এ অঞ্চলের আকাশপথে বিভিন্ন রুটে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিমান চলাচল করে।

আমরা যারা মুভি প্রেমী তারা যদি একটা বিষয় খেয়াল করি যে, এই পথটা কিন্তু বিশ্বের ভারী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলকারী পথগুলোর অন্যতম। এ অঞ্চলের আকাশপথে বিভিন্ন রুটে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিমান চলাচল করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে এই পথটির গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা যারা মুভি প্রেমী তারা একটা বিষয় খেয়াল করি, যে মুভিতে সাধারণত ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে দূর্বল বা অসহায় মানুষ বা দেশের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ লুট করে নেয়। আর তাই এমনটাও হতে পারে যে এই অঞ্চলের আশে পাশে থাকা শক্তিশালী কোন দেশ বা শক্তিশালী জলদস্যুরা এই পথে যাতায়াতকারী বিমান ও জাহাজগুলোকে লুট করে ফেলছে এবং ধ্বংসাবশেষগুলোকে কোথাও এমনভাবে লুকিয়ে রাখছে যাতে করে কেউ এসবের আর কোন হদিস না পায়। অথবা এমনটাও হতে পারে যে ক্ষমতাশীল দেশগুলো এই পথটাকে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার জন্য এই পথ সম্পর্কে এসব গুজব তথ্য ছড়াচ্ছে, যাতে করে অন্য দেশগুলো এই পথে যাতায়াত বন্ধ করে। ফলে চক্রান্তকারীরা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

তবে মূল ঘটনা যেটাই হোক না কেন, এই পথের এতসব আজব কাহিনী নিয়ে বিশ্বে আলোড়নও কিন্তু কম নয়। অদূর ভবিষ্যতে এর মুখোস নিশ্চয়ই খুলবেই। আর সেদিনই আমরা জানতে পারবো এতসব ঘটনার মূল রহস্য।

তথ্যসূত্র :

https://wikipedia.org.
Strange-world-bd.blogspot.com/2014/06/mysterious-bermuda-triangle.html?m=1
https://www.google.com/url?q=https://bengali.oneindia.com/news/international/bermuda-triangle-mystery

বিষাক্ত পাখি হুডেড পিটোহুই

আল-আমিন তুহিন

৪র্থ বর্ষ (সম্মান); রোল: ৯১৪৬।

আমরা সবাই পাখি পছন্দ করি। কারণ পাখি সৌন্দর্য আর শান্তির প্রতিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীতে কি কোনো বিষধর পাখি আছে? কিন্তু শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি যে পৃথিবীর তিন প্রজাতির পাখি নিজেদের শরীরে বিষ বহন করে। তিনটি প্রজাতির মধ্যে হুডেড পিটোহুই (Hooded Pitohui) একটি, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Pituhoi dichrous* (চিত্র ১)। পাখিটির আকার প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা। এটির মাথা কালো পালকে আবৃত এবং তাদের কালো পা গুলিতে তীক্ষ্ণ নখর রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পাখীদের তো দাঁত নেই, তাহলে কোথায় থাকে তাদের বিষ? আসলে পিটোহুই পাখির ঠোঁট ও নখে বিষ থাকে। মজার ব্যাপার হলো, এদের এ বিষ রয়েছে পালকের গোড়ায়, চামড়ায় ও লেজে।

চিত্র ১: বিষাক্ত হুডেড পিটোহুই পাখি *Pituhoi dichrous*

এরা সর্বভুক। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফল, পোকামাকড় যেমন, পিঁপড়া এছাড়াও রয়েছে কোরেসিন (Choresine) নামক বিটল্স। ধারণা করা হয় যে, কোরেসিন নামক বিটল্স খাবার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এরা এতটা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। পিটোহুই পাখিদের দেহ নিঃসৃত এই বিষের প্রকৃতি অ্যালকালয়েড যার নাম 'বাট্রাকোটক্সিন'। এটি একটি বিরল প্রকৃতির বিষ। এই বিষ আক্রান্ত প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রকে অবশ করে দেয় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আক্রান্ত প্রাণীর পেশীতে তীব্র সংকোচন দেখা দেয়। ঠিক একই ধরনের বিষ ডার্ট ফ্রগ নামক বিষাক্ত ব্যাঙের শরীরেও পাওয়া যায়। ১৯৮০ এর শেষের দিকে, বিজ্ঞানী ডামবাখার পিটোহুই পাখির প্রজননকালীন আচরণ নিয়ে কাজ করার সময় এই পাখিটির বিষধর স্বত্বা আবিষ্কার করেন।

তথ্যসূত্র:

Dumbacher, J. P., Menon, G. K. & Daly, J. W. 2009. Skin as a toxin storage organ in the endemic New Guinean genus *Pitohui*. *Am. Ornithol. Union* **126**(3): 520-530.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hooded_pitohui

https://study.com/academy/lesson/hooded-pitohui-habitat-diet-venom-facts.html

http://www.aquariumofpacific.org/onlinelearningcenter/species/hooded_pituhoi

সল্যুব্যাগ: প্লাস্টিকের বিকল্প এক উদ্ভাবনা

কানিজ বিনতে জামান
এমএস (ইকোলজি) ২০১৮; রোল: ১৪২৩৬৭১৪ ।

পরিবেশ দূষণ বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি ভয়াবহ সমস্যা। পরিবেশ দূষণের অতি পরিচিত একটি ধ্বংসাত্মক উপাদান হলো প্লাস্টিক। বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে পরিবেশ যে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তা আমাদের সকলের জানা। ১৯০৭ সালে প্লাস্টিকের আবিষ্কার বিশ্ববাসীর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসে । পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকে খুব সীমিত পরিমাণ প্লাস্টিক উৎপাদিত হতো যা খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেত। তাই এসময় প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে কারো তেমন কোন মাথাব্যথা ছিলো না। কিন্তু চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নব্বই-এর দশকে যখন প্লাস্টিকের উৎপাদন এবং এর বর্জ্য উভয়ের পরিমাণ তিন গুণেরও বেশি বেড়ে যায়। ২০০০ সালের পর থেকে প্লাস্টিক দূষণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। যার ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের আবিষ্কার আশীর্বাদ থেকে ক্রমান্বয়ে অভিশাপে রূপান্তরিত হয়েছে।

জাতিসংঘের তথ্য মতে, বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ প্লাস্টিকের ব্যাগ, বোতল, স্ট্র ইত্যাদি কেবল একবারই ব্যবহার করা হয় কিন্তু সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শতাব্দী বা তারও বেশি সময় নেয়। এটি হলো প্রকৃত বাস্তুসংস্থানীয় বিপর্যয় কারণ তাদের বেশিরভাগই স্তূপাকৃত হয় স্থলভূমি, সাগর বা মহাসাগরে। ২০১৮ সালে জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, প্লাস্টিক বিশ্বের অন্যতম উৎপাদিত একটি উপাদান, যা বিশ্বব্যাপী একটি বৃহদাকার স্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হতে চলেছে। বর্তমানে আমরা এমন এক সময়ে চলে এসেছি, যেখানে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ করে এর উৎপাদন বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তাহলে মনুষ্যসৃষ্ট এই বিপর্যয় থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী? যদি প্লাস্টিকের সমতুল্য, ক্ষতিকারক নয়, পরিবেশ বান্ধব- এমন কিছু আবিষ্কার করা যায় তবে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। পুরো বিশ্বজুড়েই প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ-বান্ধব প্লাস্টিক উদ্ভাবনায় কাজ চলছে। বিভিন্ন জৈব উপাদান ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হচ্ছে এমন প্লাস্টিক ব্যাগ যা সহজেই মাটিতে বা পানিতে মিশে যেতে সক্ষম। বাংলাদেশেও পাট দিয়ে এরকমই জৈব প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরি করা হয় যার নাম 'সোনালি ব্যাগ'। সম্প্রতি চিলিতে এমন এক প্লাস্টিক ব্যাগ উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা পানিতে দ্রবীভূত হবে এবং মিশে যাওয়ার পর তা কোন বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি করবে না। যুগান্তকারী এই প্লাস্টিক ব্যাগের নাম হলো 'সল্যুব্যাগ' (চিত্র ১)। চিলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রাজধানী সান্তিয়াগোতে 'সল্যুব্যাগ' নামক একটি বেসরকারী সংস্থা দুইজন গবেষকের সহায়তায় প্লাস্টিক এবং কম্পোস্টেবল ব্যাগের বিকল্প তৈরি করেন যার নাম দেন সল্যুব্যাগ (Solubag)। এই দুই গবেষক হলেন শিল্প-প্রকৌশলী রবার্তো অ্যাস্তেত এবং ক্রিশ্চিয়ান অলিভারস। দীর্ঘ চার বছরের গবেষণার পর তারা তেলবিহীন একটি প্লাস্টিক ব্যাগের নকশা করেন, যা সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

চিত্র ১: সল্যুব্যাগ হাতে রবার্তো অ্যাস্তেত এবং ক্রিশ্চিয়ান অলিভারস (Source: intelligentliving.com)

মূলত একটি বায়োডিগ্রেডেবল ডিটারজেন্ট তৈরি করতে গিয়েই তারা লক্ষ্য করেন যে, এর কাঁচামাল প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক হতে পারে। সল্যুব্যাগগুলি তৈরি হয় পলিভিনাইল অ্যালকোহল (পিভিএ) নামক পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ দ্বারা, যা পরিবেশ ও এর প্রাণিজগতকে দূষিত করে না। পিভিএ সাধারণত ঔষধশিল্পে ও খাদ্যশিল্পে কোটিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়। পলিভিনাইল অ্যালকোহল ছাড়া আরো কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয় যেগুলো আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) দ্বারা স্বীকৃত; ফলে উপাদানগুলো স্বাস্থ্যসম্মত। সাধারণত প্রচলিত প্লাস্টিক ব্যাগগুলো পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন যৌগ

দিয়ে প্রস্তুত করা হয়, যার কারণে মাটি বা পানি মাধ্যমে যাওয়ার পরও সেগুলো অক্ষত অবস্থায় থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রচলিত প্লাস্টিক পরিবেশে মিশে যেতে সময় লাগে ৫০০ বছরেরও বেশি। আবার মিশে যাবার পরেও তা বিষাক্ত পদার্থের বিস্তার ঘটিয়ে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করে। সল্যুব্যাগ সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট সময় নেয় পানিতে মিশে যেতে, যা এর বিশেষ একটি সুবিধা (চিত্র ২)। আর এই পদার্থ পানিতে মিশলেও ঐ পানি পান করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। সহজে দ্রবণীয় হলেও এটি এমনভাবে তৈরি যেন বৃষ্টি এবং ৪০-৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও টিকে থাকতে পারে। রবার্তোর মতে, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল এমন কোনো জিনিস তৈরি করা, যা পরিবেশকে দূষিত করবে না। তাই তারা এই ব্যাগ তৈরিতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেন।

চিত্র ২: সল্যুব্যাগঃ শুষ্ক অবস্থায় (বামে) ও পানির সংস্পর্শে (ডানে) (উৎস: trendhunter.com, steemit.com)

মূলত দু'ধরনের সল্যুব্যাগ রয়েছে। একটি হলো- সুপার মার্কেটের প্রচলিত প্লাস্টিক ব্যাগের সদৃশ, যা ঠাণ্ডা পানিতে দ্রবণীয়। এই ধরণের প্লাস্টিক ব্যাগকে ঠাণ্ডা পানিতে কিছুক্ষণ নাড়লে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগে পানিতে গলে যেতে। আর অন্যটি হলো গরম পানিতে দ্রবণীয়। এ ধরনের সল্যুব্যাগ পুনর্ব্যবহারযোগ্য শপিং ব্যাগের সদৃশ এবং মজবুত ও টেকসই। তাই একে দ্রবীভূত করতে গরম পানির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এই ব্যাগ দ্রবীভূত হতে ঠান্ডা পানিতে দ্রবণীয় ব্যাগের তুলনায় বেশি সময় নেয়। দু'ধরনের ব্যাগই সাধারণ মানুষের ব্যবহারযোগ্য। অবশ্য এখনো এসব ব্যাগ সকলের কাছে উন্মুক্ত করা হয়নি। সল্যুব্যাগ প্রস্তুতকারী চিলির কোম্পানিটি এখনো চিলি, ভারত এবং চীনের বাজারে এটি পরীক্ষা করে দেখছে। তবে ২০১৯ এর অক্টোবরের মধ্যেই চিলি, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই ব্যাগ প্রচলনের পরিকল্পনা করছে। বর্তমানে কোম্পানিটি সল্যুব্যাগের কাঁচামাল আরো নির্ভরযোগ্য এবং উন্নত করতে ব্যস্ত। শুধু বায়োপ্লাস্টিক ব্যাগ তৈরিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে কোম্পানিটি বায়োপ্লাস্টিক বোতল এবং স্ট্র তৈরির চেষ্টাও চালাচ্ছে। শুরুর দিকে সল্যুব্যাগের মূল্য বেশি হলেও তা বর্তমানে প্রাথমিক মূল্যের পাঁচভাগের একভাগ। এতে করে এসব ব্যাগ সাধারণ জনগণের সামর্থ্যের আওতায় চলে এসেছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টার জন্য সল্যুব্যাগ ইতোমধ্যে পেয়েছে 'Singularity U Award of Chili Summit 2018' প্লাস্টিকের একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে এই জাতীয় উদ্ভাবণী পণ্যগুলো মহাসাগর এবং স্থলভাগের প্লাস্টিক দূষণকে বহুলাংশে হ্রাস করতে পারবে, যা বিশ্বস্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্রঃ

https://sailuniverse.com/2018/07/31/solubag-invention-save-oceans/amp
https://www.solubag.cz/what-is-solubag/
http://build-projects.org/solubagchile/
https://ssir.org/articles/entry/Fighting_Plastic_Pollution_With_Bags_That_Dissolve_in_Water
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/this-plastic-free-bag-can-disappear-right-before-your-eyes/

প্রাণী বিষয়ক কবিতাযুগল

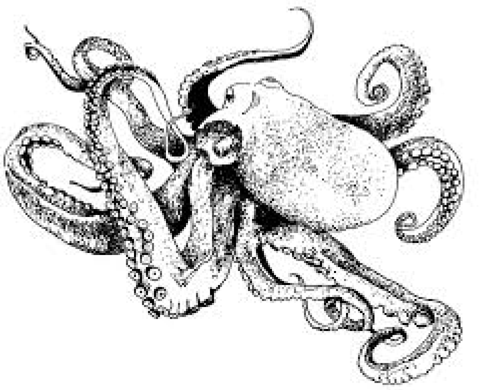

অক্টোপাস

মোসা. মাসরুফা জিন্নাত
এমএস (ফিশারীজ) ২০১৯; রোলঃ ৯১০৩।

আটটি বাহু আছে যার
Octopus নাম তার
বহুরূপী এই প্রাণী,
শরীরে আছে বিষের থলি
আমরা কি তা জানি?

Mollusca পর্বভুক্ত
মাংসাশী এই প্রাণী,
সমুদ্রতে করে বাস
আমরা সবাই জানি।

শত্রুর চোখে ধুলো দিতে
ওস্তাদ এই প্রাণী,
তাইতো এর নাম আমরা
Devil fish জানি।

নরম দেহ, নিশাচর
Cephalopoda শ্রেণী তার,
Octopoda বর্গভুক্ত
অমেরুদন্ডী এই প্রাণী।

আজব পর্ব আর্থ্রোপোডা

মোসা. সুমাইয়া পারভীন
এমএস (ফিশারীজ) ২০১৯; রোলঃ ৯১৫৫।

আজব পর্ব Arthropoda
নামটা যেমন বিচিত্র
নামের মাঝেই আছে এদের
চিনতে পারার বৈশিষ্ট্য।

সন্ধিযুক্ত পা এদের
আরো আছে Exoskeleton
বিচিত্র এই প্রাণী গুলো
দেখলে পরে জুড়ায় মন।

দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম
Haemocoel আছে শরীরে
Malpighian tubules টা তার
অংশ নেয় রেচনে।

পুকুর, নদী, সিন্ধু, পাহাড়
রয়েছে এদের দখলে
ঘাসের ফাঁকে, ঝোপে ঝাড়ে
দেখতে পাবে সহজে।

নানান রঙের প্রাণী নিয়ে
Arthropoda পর্ব
এদের নিয়ে Zoology'র
আছে অনেক গর্ব।

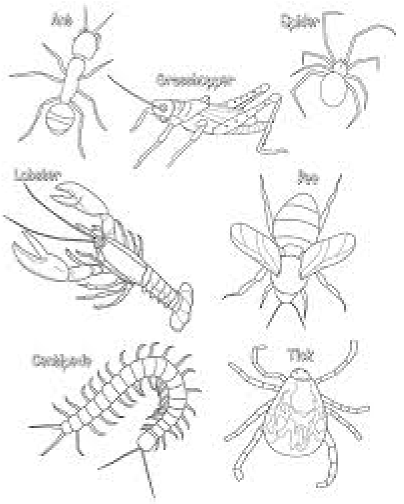

তৃণভোজী হস্তী পাখি

ফয়সাল রাহাত
৪র্থ বর্ষ (সম্মান); রোল: ৯১১৪।

প্রায় তিন টন ওজনের তিন মিটার লম্বা উটপাখির মতো প্রাণীটিকে বিশ্বের বৃহত্তম পাখির খেতাব দেওয়া হয়েছে। *Vorombe titan*, যার আক্ষরিক অর্থ মালাগাসি এবং গ্রীক ভাষায় 'বড় পাখি', একটি বিলুপ্ত উড়ন্ত পাখি, যা একসময় মাদাগাস্কারে বিস্তৃত ছিল। এটি একটি উদ্ভিদভোজী প্রাণী। বিশ্বজুড়ে সংগ্রহশালা থেকে শতাধিক Elephant bird-এর হাড় অধ্যয়ন করে, জুলজিকাল সোসাইটি অব লন্ডনের (ZSL) গবেষকরা এখন কয়েক দশকের পরস্পরবিরোধী প্রমাণের একটি যথাযথ জবাব প্রদান করেছেন যার উপরে ডানাযুক্ত প্রাণীটি সত্যই বিশ্বের বৃহত্তম ছিল। তারা দেখতে পান যে, *V. titan* ৮৬০ কেজি ওজনের পালকযুক্ত হস্তী পাখির একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি।

চিত্র: তৃণভোজী হস্তী পাখি, বৈজ্ঞানিক নাম *Aepyornis maximus*

১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী সি. ডব্লিউ. অ্যান্ড্রুজ একটি নমুনা পেয়েছিলেন যার নাম ছিল *Aepyornis titan*। বছরের পর বছর ধরে এটি *Aepyornis maximus* নামে অন্য একটি প্রজাতির অস্বাভাবিকভাবে বড় নমুনা হিসাবে খারিজ হয়ে যায়, যা এখন অবধি বিশ্বের বৃহত্তম পাখি হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে জেডএসএল-এর গবেষণা থেকে জানা গেছে যে অ্যান্ড্রুয়ের "টাইটান" পাখিটি আসলে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি ছিল। এর হাড়ের আকার এবং আকৃতি অন্যান্য সমস্ত হাতি পাখির চেয়ে এতটাই আলাদা যে এটি এখন নতুন জেনাসের নাম *Vorombe* দেওয়া হয়েছে। এর নতুন শ্রেণিবিন্যাসটি নিরামিষভোজী *europasaurus* এবং *europasaurus* সহ কিছু ডাইনোসর প্রজাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দেহের ভর সহ বিশ্বের বৃহত্তম পাখি তৈরি করেছে। তাদের শক্তিশালী পা এবং ভয়ঙ্কর লেবু থাকা সত্ত্বেও *V. titan* পাখিগুলি শান্ত নিরামিষাশী ছিল, মূলত ফলের উপর বাস করত। তাদের বড় আকারের ডিমের মধ্যে একটি পুরো পরিবারকে খাওয়ানো যেত, যদিও সরাসরি বাসা চালানোর কোনও প্রমাণ নেই।

জেডএসএল ইনস্টিটিউট অফ জুলজির ডা. জেমস হ্যানসফোর্ড এবং রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশিত গবেষণার প্রধান লেখক বলেছেন, "হাতি পাখি মাদাগাস্কারের মেগাফুনার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্বীপগুলির বিবর্তনীয় ইতিহাসের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল- লেমুরদের চেয়ে আরও বেশি" "এর কারণ হল বৃহত-দেহযুক্ত প্রাণীগুলি উদ্ভিদগুলি খাওয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, বায়োমাস ছড়িয়ে দেওয়ার এবং মলত্যাগের মাধ্যমে বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তারা যে বৃহত্তর বাস্তুতন্ত্রের উপর বাস করে তার ব্যাপক প্রভাব ফেলে মাদাগাস্কার এখনও এই পাখিদের বিলুপ্তির প্রভাব ভোগ করছে।"

V. tatan ১,০০০ বছর আগে পর্যন্ত মাদাগাস্কারে ঘোরাফেরা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়, তবে কী কারণে প্রজাতিগুলি মুছে ফেলা হয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। জেডএসএল বিজ্ঞানীদের একটি দল আগের গবেষণায় আবিষ্কার করেছিল যে বিলুপ্তপ্রায় মাদাগাস্কার হাতির পাখি থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন হাড়গুলি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দ্বারা শিকার এবং কসাইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাটা চিহ্ন এবং ফ্র্যাকচার দেখিয়েছিল। রেডিওকার্বন ডেটিং কৌশল ব্যবহার করে দলটি তখন নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে এই দৈত্য পাখি কখন মারা গিয়েছিল, যার ফলে তারা পুনরায় মূল্যায়ন করতে পরিচালিত করেছিল কখন মানুষ প্রথম মাদাগাস্কারে পৌঁছেছিল। লেমুর হাড় এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির উপর পূর্ববর্তী গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে মানুষ ২,৪০০-৪,০০০ বছর আগে মাদাগাস্কারে প্রথম এসেছিল।

তবে, নতুন কৌশলগুলি ১০,৫০০ বছর আগে মাদাগাস্কারে মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ সরবরাহ করেছিল- এই পরিবর্তিত হাতি পাখির হাড়কে দ্বীপের মানুষের প্রাচীনতম প্রমাণ হিসাবে প্রমাণিত করে। সর্বশেষ গবেষণার সহ-লেখক প্রফেসর স্যামুয়েল টারভে বলেছেন: "অতীতের প্রজাতির বৈচিত্রের সঠিক ধারণা না থাকলে আমরা মাদাগাস্কারের মতো অনন্য দ্বীপপুঞ্জের বিবর্তন বা বাস্তুশাস্ত্রকে সঠিকভাবে বুঝতে পারি না বা মানুষের আগমনের পর থেকে যা হারিয়েছিল তা পূনর্গঠন করতে পারি না। "কীভাবে আজকের হুমকী প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায় তা নির্ধারণের জন্য জীববৈচিত্র্য হ্রাসের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:
দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট নিউজ।
https://i.pinimg.com/originals/fc/c1/d8/fcc1d8002de4d4f6826b72ed2606036a.jpg

পৃথিবীর আয়না

আসলাম খান রকি
৪র্থ বর্ষ (সম্মান); রোল: ৯১২৭।

সাধারণ অর্থে আয়না বলতে আমরা কাঁচের তৈরি ছোট্ট একটি বস্তুকে বুঝি, যার মাধ্যমে যে কোনো কিছুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা যায়। আয়না নিয়ে ছোটবেলায় আমরা অনেক রূপকথার গল্প শুনেছি। শুনেছি আয়না আবিষ্কারের রহস্যের কথা, আয়না নিয়ে সূর্যদেবতার রাগ ভাঙানোর কল্প-কাহিনী, শুনেছি কৃষকের হারিয়ে যাওয়া বাবাকে দেখতে পাওয়ার কথা, আরও কত্ত কিছু...তাই না? কিন্তু কখনো কি আমরা শুনেছি পৃথিবীর আয়নার কথা? পৃথিবীর আয়না! এ আবার হয় নাকি? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন, পৃথিবীর আয়না। আমরা আমাদের নিজের ছোট্ট এই চেহারার সৌন্দর্য ঠিক রাখতে আয়না ব্যবহার করতে পারলে, সুবিশাল রহস্যময় এই পৃথিবীর কেন আয়না থাকবে না? মনে করেন আপনি হাঁটতে শুরু করলেন, হঠাৎ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন পায়ের নিচে স্বচ্ছ চকচকে সমভূমি। আর সেই সমভূমির উপর আপনার মায়াবী প্রতিচ্ছবি। কি অবাক হচ্ছেন?

বলছিলাম, পৃথিবীর আয়নাখ্যাত বলিভিয়ার সালার ডি ইউনি (Salar De Uyuni) বা লবণের সমভূমির কথা। সালার স্প্যানিশ শব্দ, যার অর্থ লবণ সমতল, ইউনি আমরার ভাষা থেকে উদ্ভূত- এর অর্থ ঘের বা পরিবেষ্টন করা। একত্রে সালার ডি ইউনি -এর অর্থ দাঁড়ায় আবদ্ধভাবে পরিবেষ্টিত লবণের সমভূমি।

চিত্র ১. সালার-ডি- ইউনি-এর ফ্লামিঙ্গো পাখি।

এখানে প্রবেশের শুরুতেই রয়েছে একটি প্রাচীন রেল কবরস্থান, আরও রয়েছে লবণের তৈরি একটি হোটেল। সালার-ডি-ইউনি সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১২০০০ ফুট উচ্চতায় বলিভিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চিলির সীমান্তের সঙ্গে অবস্থিত এবং ১০৫৮২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক হ্রদ, যাদের রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই সালার-ডি-ইউনি। ধারণা করা হয়, প্রায় ৪০,০০০ বছর পূর্বে এখানে একটি প্রাগৈতিহাসিক বিশাল হ্রদ ছিল, যার নাম Lake Minchin। এই হ্রদটি শুকিয়ে দুটি ছোট হ্রদ এবং দুটি লবণ মরুভূমির তৈরি হয়, যার মধ্যে একটি সালার-ডি-ইউনি। বলিভিয়ার লবণের প্রধান উৎস এটি। যার লবণের পরিমাণ প্রায় ৬৪ মিলিয়ন টন। এখান থেকে প্রতি বছর ২৫০০০ টন লবণ উত্তোলন করা হয়। শুধু লবণই নয়, ধারণা করা হয় পৃথিবীর লিথিয়ামের ৫০-৭০ ভাগ মজুদ আছে এই লবন ভূমিতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ অনন্য উদাহরণ এই সালার-ডি-ইউনি। জানুয়ারি-আগস্টে মরুভূমির চোখ ধাঁধানো সাদা আলো দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। রৌদ্রজ্বল দিনে একে মনে হয় বিস্তৃত শুন্যতার জগৎ। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, সামান্য বৃষ্টির পানিতেই এই শুষ্ক অঞ্চল রূপান্তরিত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আয়নায়। এর অপরূপ দৃশ্য সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত।

বৃষ্টির পর আপনি যদি এর উপর দিয়ে হেঁটে যান, তবে পায়ের নিচে আপনার ক্লোন দেখে প্রথম দর্শনেই অবাক হবেন। উপরের আকাশে যদি সাদা-কালো মেঘ থাকে, তবে এই লবণ ভূমি এক অপরূপ দৃশ্য ধারণ করে। মনে হয় যেন আকাশের মেঘ মাটিতে নেমে এসেছে। আর আপনি সেই মেঘের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছেন। সূর্যাস্তের সময়, সূর্যের রক্তিম বর্ণের প্রতিফলন, সে এক অনন্য অপরূপ সৌন্দর্য। সালার-ডি-ইউনি আন্দিজ পর্বতের খুব কাছে হওয়ায় আকাশকে অবলোকন করা যায় চোখ জোড়ানো সৌন্দর্যে। এই লবণ ভূমির পাশে রয়েছে একটি গাঢ় গোলাপি জলের হ্রদ। যেটি গোলাপি ফ্লামিঙ্গো পাখির প্রজনন কেন্দ্র। এ ছাড়া পুরো এলাকাকে অত্যন্ত সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে রঙ-বেরঙের পাহাড়, অসংখ্য পাখি, বন্য প্রাণীকুল। প্রকৃতির এই আয়নায় নিজের চেহারা অবলোকন করতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন এই Salar-De-Uyuni সমভূমিতে।

তথ্যসূত্রঃ
www.Wikipedia.com
www.Jugantor.com.bd
www.protikhon.com

রহস্যময় জীব 'ব্লব'

মোসাঃ মাসরুফা জিন্নাত
এমএস (ফিশারীজ) ২০১৯; রোলঃ ৯১০৩।

পৃথিবীর এ বিচিত্র পরিবেশের প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন প্রাণী রয়েছে। এ সকল প্রাণীদের বৈচিত্র্য আমাদের নানাভাবে মুগ্ধ করে। তবে অনেক সময় এদের কিছু রহস্যময় ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে অজানা থেকে যায়। সম্প্রতি এমন এক রহস্যময় জীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি। বিজ্ঞানীরা রহস্যময় এই জীবটির নাম দিয়েছেন 'ব্লব'। ব্লব (blob) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে -ঘন তরলের এক ফোঁটা (drop of a thick liquid)। হলুদ রঙের এই জীবটি দেখতে ছত্রাকের মতো কিন্তু আচার-আচরণ, চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র একেবারেই একটি প্রাণীর মতো। তবে এটি কোনো উদ্ভিদ নয়। বাহ্যিক গড়নে এটি মাশরুম কিন্তু অভ্যন্তরে প্রাণীসদৃশ (চিত্র ১)।

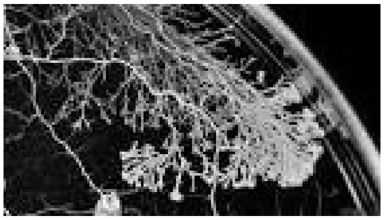

চিত্র ১: রহস্যময় জীব 'ব্লব'।

সম্প্রতি প্যারিসের চিড়িয়াখানায় এই জীবটির সন্ধান পাওয়া গেছে। এককোষী এই জীবটির মস্তিষ্ক অনুপস্থিত, এমনকি চোখ, মুখ এবং পেটও অনুপস্থিত। তবে সবকিছু ঠিকই বুঝতে পারে এবং খিদেও পায় এই জীবটির। এটি খাবার চিনতে কখনও ভুল করে না এবং খুব দ্রুত তা হজম করে ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ব্লবের কোনো পা নেই, এমনকি ডানাও নেই, তবুও নিজের মতো করে চলাফেরা করতে পারে। ব্লবের পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রচন্ড। একে কেটে দু'টুকরো করে ফেললেও মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে। বিজ্ঞানীরা ব্লবের প্রায় ৭২০ ধরণের 'সেক্স' বা যৌন রূপ আবিষ্কার করেছেন।

প্যারিস মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির ডিরেক্টর ডেভিড ব্রুনো, এই জীবটিকে "প্রকৃতির রহস্য" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, ব্লবের মস্তিষ্ক নেই কিন্তু শেখার অদ্ভূত ক্ষমতা রয়েছে। একজন যা শেখে, অপরজনের মধ্যে সেই বার্তা পৌঁছে দেয়। এটি যে উদ্ভিদ নয়, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একশ'ভাগ নিশ্চিত। কিন্তু এটি ছত্রাক না প্রাণী সে বিষয়ে এখনও কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ইয়াং স্টিভ ম্যাককুইন অভিনীত ১৯৫৮ সালের সায়েন্স-ফিকশান হরর বি-মুভির এক এলিয়েন "দ্য ব্লব" এর নামানুসারে এককোষী এই জীবটির নাম রাখা হয়েছে 'ব্লব'।

তথ্যসূত্রঃ
একুশে টেলিভিশন; ১৮ অক্টোবর, ২০১৯।
সমকাল; ১৯ অক্টোবর, ২০১৯।
www.google.com

ডেঙ্গু জ্বর

মো. ফিরোজ সরকার
৩য় বর্ষ (সম্মান); রোল: ৯১০৫।

একটি স্বাভাবিক ও কৌতুহল উদ্দীপক প্রশ্ন দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করা যাক। ডেঙ্গু জ্বরে মানুষ মারা যায় কেন? প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে ডেঙ্গুর ফলে সৃষ্ট দু'টি প্রধান সমস্যার কথা। সমস্যা দুটি হলো ঃ প্লাজমা চোয়ানো (plasma leakage) এবং রক্তপাত (bleeding)। রক্তনালী থেকে প্লাজমা চুইয়ে বের হয়ে আসে। আর রক্তের প্লেটিলেট গণনা (platelet count) অনেক কমে গেলে রক্তপাত হয়। ফলে রোগীর রক্তের আয়তন (blood volume) কমে গিয়ে রোগী শকে (shock) আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তাহলে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর মূল কারণ হলো শক। তাই, ঠিক মতো শক ব্যবস্থাপনা করাই ডাক্তারের প্রধান কাজ। আচ্ছা প্রশ্ন উঠতে পারে, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলেই কী রোগী যে কোন মূহূর্তে শকে যেতে পারে? আসলে না। জ্বর শুরু হওয়ার পর প্রথম তিন দিন পর্যন্ত রোগীর মোটামোটি শকে যাবার সম্ভাবনা নেই। চতুর্থ দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত এই সময়ে প্লাজমা লিকেজ ও প্লেটিলেট গণনা কমতে শুরু করে। এই সময়টাকে বলে সঙ্কট কাল (critical period)। এই সঙ্কট কালে রোগী যে কোন মুহূর্তে শকে এ গিয়ে মারা যেতে পারে। সপ্তম দিনের পর রোগী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠে। তাহলে আমাদের ভয় মূলতঃ সঙ্কট কালের ৩-৪ দিন সময়টা। তখন আমাদের করণীয় কী?

সঙ্কট কালে রোগীকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণে বা মনিটরে রাখতে হবে। যখনই প্লাজমা লিকেজের লক্ষণ দেখা দিবে, তখনই রোগীকে আইসোটনিক আইভি ফ্লুইড (Isotonic intravenous [IV] fluid) বা নরমাল স্যালাইন দিতে হবে; কিংবা রক্তপাত শুরু হলে সাথে সাথে রক্ত দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে রোগী শকে যেতে না পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রক্তপাত শুরু হলে RBC সমেত পুরো রক্ত (packed RBC বা whole blood) দিতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু প্লেটিলেট দিলে কিন্তু হবে না। ডেঙ্গু জ্বরে শুধুমাত্র প্লেটিলেট দেয়ার কোন সুফল প্রমাণিত নয়। হাতে যথেষ্ট প্লেটিলেট মজুদ থাকলে দেয়া যেতে পারে; কিন্তু এটা নিয়ে অযথা হয়রান হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ অতটা জরুরী নয়। এক ব্যাগ প্লেটিলেটের জন্য প্রয়োজন হয় চারজন রক্ত দাতার (donor)। যথেষ্ট ঝামেলা। কি দরকার এত ঝামেলার? ডেঙ্গু জ্বর কমে গেলে প্লেটিলেট গণনা আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এর ভিতরে রক্তপাত হলে পুরো রক্ত তো আছে, সেটি দেয়া যেতে পারে। মাঝখান থেকে প্লেটিলেট নিয়ে পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু রোগীর যদি জরুরী ভিত্তিতে (emergency) কোন অপারেশন লাগে, কিন্তু প্লেটিলেট গণনা কম থাকায় সার্জন অপারেশন করতে রাজি হচ্ছেন না, তখন? একমাত্র তখনই আপনি প্লেটিলেট দিতে পারেন। এছাড়া প্লেটিলেট দেয়ার তেমন কোন প্রয়োজন হয় না।

আরেকটি প্রশ্ন, প্লাজমা লিকেজ হলে আইভি ফ্লুইড কতটুকু এবং কতদিন দিতে হবে? প্রকৃত পক্ষে প্লাজমা লিকেজ শুরুর পর সাধারণত ৪৮ ঘন্টা স্থায়ী হয়। এর পর রোগীর রিকভারি (recovery) শুরু হয়ে যায়। তাই, আইভি ফ্লুইড দিতে হবে প্লাজমা লিকেজ শুরু হবার পর ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত। যদি এর চেয়ে বেশি দিয়ে দেই তাহলে সমস্যা কী? 'বেশি জল এ বেশি বল'- তাই নয় কী? কিন্তু না, তা' নয়। ৪৮ ঘন্টা পর আইভি ফ্লুইড দিলে রোগীর রক্তের আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে (volume overload) রোগীর শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে। তাই, সাবধান। খুব হিসেব করে চলতে হবে। আইভি ফ্লুইড কতটুকু দিবো? রোগীর দেহে আইভি ফ্লুইডের পরিমান বের করার সূত্র মেডিক্যাল পাঠ্য বইগুলোতে সুন্দর করে দেয়া আছে। রোগীর শরীরের ওজন অনুযায়ী কতটুকু ফ্লুইড লাগবে, সেটার একটা চার্ট আছে। ওটি ব্যবহার করে সঠিক পরিমান ফ্লুইড দিতে হবে।

এবার আরও একটি প্রশ্ন। প্লাজমা লিকেজ কখন শুরু হবে বা হলো বুঝবো কিভাবে? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর হলো- রোগীর যদি pleural effusion বা ascites হয় কিংবা রোগীর হিমাটোক্রিট (haematocrit) যদি ২০% এর চেয়ে বেশি বেড়ে যায় কিংবা রোগীর সিস্টোলিক রক্তচাপ (স্বাভাবিক ১২০মিমি) যদি কমে যায় আর ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ (স্বাভাবিক ৮০মিমি) যদি বেড়ে যায় কিংবা প্রস্রাবের পরিমান যদি কমে যায় কিংবা হৃদস্পন্দন (pulse rate) বেড়ে যায়, তখনই বুঝতে হবে রোগীর প্লাজমা লিকেজ শুরু হয়েছে। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর জন্য একটি খুবই দরকারী তথ্য সেটি হলো, জ্বর আসার শুরুতে একবার হিমাটোক্রিট দেখা উচিত, তারপর সঙ্কট কালে হিমাটোক্রিট ঘন ঘন করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে, হিমাটোক্রিট বাড়ছে নাকি কমছে?

আচ্ছা, রক্তপাত শুরু হলে তো চোখেই দেখতে পাবো। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, দেহের ভিতরে রক্তপাত (internal bleeding/haemorrhage) হচ্ছে, তা' হলে কিভাবে বুঝবো? এক্ষেত্রে হিমাটোক্রিট হঠাৎ করেই খুব কমে যাবে। তখনই বুঝতে হবে দেহের ভিতরে বা বাইরে কোথাও রক্তপাত হচ্ছে। মোটামোটি সাধারণ সূত্রটি নিচের মতো:

১. ডেঙ্গু জ্বরের সঙ্কটকালে রক্তচাপ কম কিন্তু হিমাটোক্রিট বেশি= প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে;
২. ডেঙ্গু জ্বরের সঙ্কটকালে রক্তচাপ কম এবং হিমাটোক্রিটও কম= কোথাও রক্তপাত হচ্ছে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই একটি ব্যাপার খোলাসা হয়েছে যে, ডেঙ্গু রোগীর পর্যবেক্ষণে রক্তচাপ পরীক্ষণ এবং হিমাটোক্রিট টেস্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আর একটি প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করা যাক। রোগীর প্লাজমা লিকেজ শুরু হওয়ার পর তো আইভি ফ্লুইড দিতে হবে। কিন্তু তার আগে, অর্থাৎ ডেঙ্গু জ্বর সনাক্ত হওয়ার আগে, যেমন জ্বর হওয়ার প্রথম ১ থেকে ৩ দিন কী কী করতে হবে? সংক্ষেপে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. রোগীকে বেশি করে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে, যেন দিনে ৪ বার এর বেশি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্রাব হয়।
২. দিনের বেলাতেও মশারী টানিয়ে রোগীকে ভেতরে রাখতে হবে।
৩. জ্বর ও ব্যথার জন্য স্বাভাবিক প্যারাসিটামল-জাতীয় ওষুধ দিতে হবে।
৪. তবে রোগীকে কোন রকম NSAID যেমন, aspirin বা steroid দেয়া যাবে না ।

তথ্যসূত্র:

www.wikipedia.com/dengue/effect

প্রবন্ধটির জন্য লেখক ড. আব্দুল্লাহ (কীটতত্ব) ও ড. মো. ফজলুল হক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি-এর নিকট কৃতজ্ঞ।

বিভাগের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সমাচার

প্রফেসর ড. মো. আনিছুর রহমান
আহ্বায়ক
খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপ-কমিটি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষেও অন্ত:বিভাগ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে থাকে। এই প্রতিযোগিতা বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে পরিচিতি ও সুসম্পর্ক স্থাপনে একটি মেলবন্ধন হিসেবে কাজ করে এবং একইসাথে আন্ত:বিভাগ প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্য খেলোয়াড়দের বাছাইকরণে বিরাট ভূমিকা রাখে। বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিবছর আন্ত:বিভাগ ফুটবল ও ক্রিকেটে ছাত্রছাত্রীরা প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপূন্য প্রদর্শন করে আসছে।

বিভাগের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় যেমন ভাল, পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত কর্মকান্ডেও তেমনি তারা চৌকস। বিশেষ করে মেয়েরা অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন ইভেন্টে আন্ত:বিভাগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এনে দিয়ে বিভাগের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। এছাড়া টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন (একক ও দ্বৈত) ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জনে ধারাবাহিকতা ধরে রাখায় বিভাগ তাদের বিশেষভাবে পুরস্কৃতও করেছে। অন্যান্য ইভেন্ট যেমন দাবা, ক্যারাম, ইত্যাদিতেও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে এবং আশা করছি আগামীতে সকল ইভেন্টেই তারা বিভাগকে বিজয়ী ট্রফি উপহার দেবে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রতিবারের মতো এবারও বিভাগে অন্ত:কক্ষ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ক্রীড়ার বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন লুডু, ক্যারম, তাস, টেবিল টেনিস, দাবা ইত্যাদিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন কোরআন তেলাওয়াত, গীতা পাঠ, বাংলা ও ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি, গান (রবীন্দ্র সংঙ্গীত, নজরুল গীতি, আধুনিক, দেশাত্ববোধক, পল্লীগীতি), একক অভিনয়, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদিতে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন, রানার-আপ ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এবার আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, ২০১৯ আয়োজন করে এবং স্নাতক পর্যায়ে অন্যান্য বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে এবং ১ম স্থান অধিকার করে। বিভাগের ১ম স্থান অধিকারী ছাত্র মো. বাদশা আলম পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মিলিতভাবে প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করে রানার-আপ ট্রফি অর্জন করে। প্রতি বছরই বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-এ আমাদের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সফলতার শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করে। তাই, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতির পক্ষ থেকে সকল বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাই।

নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ বা কোভিড-১৯

ড. মো. ফজলুল হক

কোভিড-১৯ কী?

কোভিড-১৯ (COVID-19) হলো অতি সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া একটি নতুন করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট সংক্রামক রোগ। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে প্রথম কোভিড-১৯ রোগটি নতুন স্থানীয়-রোগ হিসেবে আবির্ভাব হয়। মাত্র তিন মাসের মধ্যে কোভিড-১৯ রোগটি পৃথিবীর একটি বিশাল অঞ্চলে বা অনেকগুলো দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেসব দেশে এর মারাত্মক সংক্রমণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণে ২০২০ সালের মার্চ মাসের ১১ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কোভিড-১৯কে বিশ্বমহামারী হিসেবে ঘোষণা করে। কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হলে শ্বাসকষ্টসহ শ্বসনতন্ত্রের গুরুতর ও তীব্র রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। এই নতুন ভাইরাস এবং রোগটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে প্রাদুর্ভাব শুরুর পূর্বে অজানা ছিল। প্রথমে এই ভাইরাসটিকে “নভেল করোনাভাইরাস” নামে ডাকা হচ্ছিল। পরে এর নাম দেয়া হয় SARS-CoV-2 (Severe Acquired Respiratory Syndrome- Coronavirus-2) (Wu *et al.*, 2020)। তবে, অনেক গবেষক মনে করেন কোভিড-১৯ নামের এর সাথে মিল রেখে ভাইরাসটির নাম 2019-nCoV হওয়া উচিৎ ছিল (Jiang *et al.*, 2020)।

করোনাভাইরাস কী?

SARS-CoV-2 নামক করোনাভাইরাস হচ্ছে এনভেলপযুক্ত আরএনএ ভাইরাস যার চারপাশে ছোট ছোট কাঁটা (স্পাইক) সজ্জিত থাকে। করোনাভাইরাস জিনোম চারটি বড় স্ট্রাকচারাল প্রোটিন যথা: স্পাইক (এস) প্রোটিন, নিউক্লিওক্যাপসিড (এন) প্রোটিন, মেমব্রেন (এম) প্রোটিন এবং এনভেলপ (ই) প্রোটিনকে এনকোড করে (Schoeman and Fielding, 2019)। এদের মধ্যে স্পাইক (এস) প্রোটিন করোনা ভাইরাসকে প্রত্যাশিত পোষক কোষে প্রবেশের জন্য সহায়তা করে (Li, 2016)।

করোনাভাইরাসের প্রাকৃতিক উৎস কি?

করোনভাইরাস প্রকৃতিগতভাবে বাদুড়ের দেহে বাস করে এবং রোগ সৃষ্টি করে। তবে করোনভাইরাস অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর দেহেও রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এমন বেশ কয়েকটি পরিচিত করোনাভাইরাস আছে যারা শুধু অন্য প্রাণীদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু মানুষকে সংক্রমিত করে না। কোনও অজানা কারণে এসব ভাইরাসে হয়তো হঠাৎ এমন কোন পরিবর্তন ঘটে যার ফলে তারা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হবার সক্ষমতা অর্জন করে।

করোনাভাইরাস কীভাবে মানবদেহে প্রবেশ করে?

যেকোনো ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য অবশ্যই তাকে জীবিত কোনও কোষে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু কোনো ভাইরাস চাইলেই যেকোনো কোষে প্রবেশ করতে পারেনা। ভাইরাস কোন কোষে প্রবেশ করতে চাইলে ঐ কোষের মেমব্রেনে (ঝিল্লিতে) বিদ্যমান রিসেপ্টরসমূহের যে কোনো একটির পরিপূরক প্রোটিন ঐ ভাইরাসে উপস্থিত থাকতে হবে। কোষের এই রিসেপ্টর হচ্ছে নিরাপত্তার জন্য বাসার দরজায় লাগানো তালার মতো। আর ভাইরাসের পরিপূরক প্রোটিন হচ্ছে সেই তালার চাবির মতো। এক্ষেত্রে, যার কাছে সেই তালার চাবি থাকবে সে শুধু তালা খুলে সেই বাসায় প্রবেশ করতে পারবে। ঠিক তেমন যে ভাইরাসের কাছে নির্দিষ্ট কোষের রিসেপ্টরের পরিপূরক প্রোটিন থাকবে সেই শুধু ঐ কোষে প্রবেশ করতে পারবে। গবেষকরা দেখেছেন যে SARS-CoV-2 এর স্পাইক বা কাঁটার মতো অংশে যে প্রোটিন আছে তা মানবকোষে বিদ্যমান একটি রিসেপ্টরের পরিপূরক। মানবকোষের এই রিসেপ্টরের নাম Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2)। ফলে এই স্পাইক (এস) প্রোটিন মানবকোষের ACE2 রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়ে SARS-CoV-2 কে কোষের ভিতরে প্রবেশের জন্য সুযোগ করে দেয় (Zhang *et al*. 2020)।

নভেল করোনাভাইরাসের (SARS-COV-2) উৎপত্তি কীভাবে?

SARS-CoV-2 কী অন্য কোনও প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে ঢুকেছে নাকি জীবাণু অস্ত্রের গবেষণাগার থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। যেহেতু SARS রোগের জন্য দায়ী SARS-CoV যা সাধারণত বাদুড়ের দেহে থাকে তার জেনোম সিকোয়েন্সের সাথে SARS-CoV-2 এর জেনোম সিকোয়েন্সের ৭৯.৫% মিল রয়েছে তাই দাবি করা হয় যে নতুন এই ভাইরাসটির উৎস হচ্ছে বাদুড় (Zhou *et al.*, 2020)। আবার Pangolin-CoV যা বনরুই বা প্যাঙ্গোলিন নামক স্তন্যপায়ীর দেহে থাকে তার জেনোম সিকোয়েন্সের সাথে SARS-CoV-2 এর জেনোম সিকোয়েন্সের ৯১.০২% মিল রয়েছে। তাই দাবি করা হয় যে, নতুন এই ভাইরাসটির উৎস হচ্ছে বনরুই (Zhang *et al.*, 2020)।

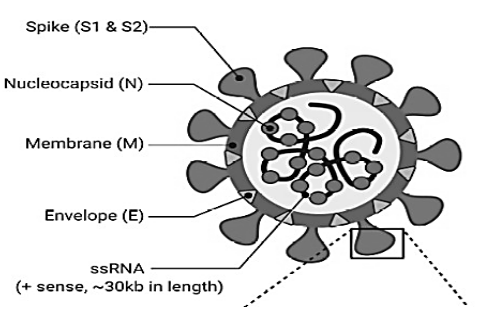

চিত্র ১: SARS-COV 2 -এর গঠন (Hasöksüz *et al.*, 2020)।

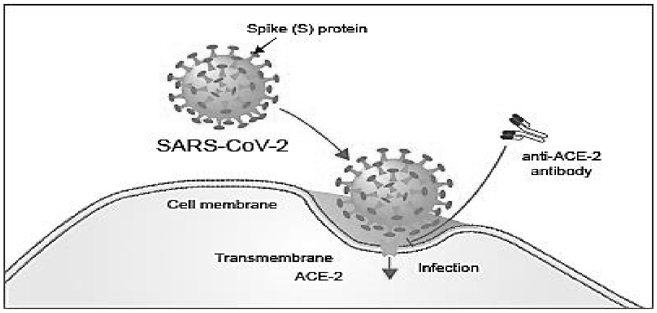

চিত্র ২: স্পাইক প্রোটিনের সাথে রিসেপ্টর মিথস্ক্রিয়ার ফলে ভাইরাসটি এন্ডোসাইটোসিসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোষে প্রবেশ করে (rnds systems.com)।

তবে এটা এখনো নিশ্চিত নয় যে SARS-CoV-2 এর স্পাইক প্রোটিনের যে পরিবর্তনের ফলে এটি মানুষকে সংক্রামিত করার সক্ষমতা অর্জন করেছে তা কোথায় ঘটেছে। কোনও প্রাণীর দেহে, নাকি ল্যাবরেটরিতে? যদিও SARS-CoV-2 এর স্পাইক প্রোটিনের এই পরিবর্তন ল্যাবরেটরিতে করা হয়েছে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইরান, রাশিয়া, ব্রিটেন এ বিষয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করে চলেছে (BBC)। এই বিতর্কের মধ্যে একদল গবেষক দাবি করেন যে SARS-CoV-2 এর স্পাইক প্রোটিনের পরিবর্তন প্রাকৃতিক উপায়ে ঘটেছে এবং এটা ঘটেছে বনরুই-এর দেহে (Zhang *et al.*, 2020)। আর স্পাইক প্রোটিনের এই পরিবর্তনের ফলে SARS-CoV-2 মানবকোষের ACE2 রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে মানুষকে সংক্রামিত করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। তবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম ব্যক্তিটি (patient zero) কে সেটি এখনো অজানা। Patient zero কে খুঁজে পেলে ভাইরাসের উৎপত্তির রহস্য জানা সহজ হবে। তা না হলে ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে।

নভেল করোনাভাইরাস কী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্য একটি মোক্ষম জীবাণু অস্ত্র?

এটা ঠিক যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইরান, রাশিয়া, ব্রিটেন একে অপরের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করে চলেছে তাতে শুধুই ভয়, গুজব এবং ঘৃণা ছড়াবে এবং এই সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হবে। কিন্তু, এসব ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে আমরা একটা চরম সত্যকে উপেক্ষা করছি। আর তা হলে করোনাভাইরাসের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন এটা এখন চরম সত্য যে, জীবাণু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি করোনাভাইরাসের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন এটি একটি অতি সংক্রামক জীবাণু যা বিভিন্ন জৈবিক তরল যেমন লালাতে কয়েকদিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। এ ছাড়া করোনাভাইরাসজনিত রোগের সুপ্তিকাল দীর্ঘ। তাই, বিশ্বনেতাদের জন্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষা করার সাথে সাথে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে এই করোনাভাইরাস যেন কোন ভাবেই কোনও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্য একটি মোক্ষম জীবাণুঅস্ত্র হয়ে না ওঠে। বিশ্বনেতাদের এটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যে বিশ্বের প্রতিটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, সামরিক বাহিনীসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বয়স্ক ব্যক্তিরা। আর করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এ মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। এর অর্থ হল সন্ত্রাসীদের কাছে যে সকল ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, করোনাভাইরাস ব্যবহার করে তাদেরকে হত্যা করা ততো সহজ। সন্ত্রাসীরা যেমন শরীরে বিস্ফোরক বহন করে আত্মঘাতী হতে পারে, তেমনি তারা স্বেচ্ছায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নিজ দেহ থেকে প্রত্যাশিত ব্যক্তির দেহে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটাতে পারে। যেহেতু এই করোনাভাইরাসজনিত রোগের সুপ্তিকাল ১৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে, সেহেতু আক্রান্ত ব্যক্তির রোগের লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই প্রচলিত সুরক্ষা ব্যবস্থার ধাপগুলো পার করে সন্ত্রাসীরা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে। এ ছাড়া জীবাণু অস্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ব্যক্তিকে সংক্রমিত করার আরও অনেক উপায় রয়েছে যেসব উপায় সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করতে পারে। যেমন, বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে যে সকল উপকরণ নিয়মিত ব্যবহার হয় যথা: ফুলের মালা ও তোড়া, মেডেল, মাইক্রোফোন ইত্যাদিকে সহজে ভাইরাস বহনকারী লালা দ্বারা সংক্রমিত করা। ফলে এসব উপকরণের সংস্পর্শে যে সকল ব্যক্তি আসবেন তারাই ভাইরাসটি দ্বারা সংক্রমিত হবেন। তাই, করোনাভাইরাসের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে সেই বিতর্ক ভুলে সবার উচিত করোনাভাইরাস যেন সন্ত্রাসীদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না হয় তার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস গ্রহণ করা।

কোভিড-১৯-এর সুপ্তিকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড কত দিন?

কোভিড -১৯ এর সুপ্তিকাল (incubation period) হচ্ছে ২ থেকে ১৪ দিন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির দেহে SARS-CoV-2 প্রবেশ করলে ২ দিন থেকে ১৪ দিন পর রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)। তবে বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে দেহে SARS-CoV-2 প্রবেশের ৫ দিন পর কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেয়েছে (Lauer *et al.*, 2020)। সুপ্তিকালে থাকার এই সময়কালে সংক্রামিত ব্যক্তির দেহে ভাইরাস থাকলেও সে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করবে। এই অবস্থায় সে নিজের অবস্থান, অভ্যাস, খাদ্য বা অন্য কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করলেও নির্দিষ্ট সময় পর তার দেহে কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে। তবে ভাল অভ্যাস, খাদ্য বা অন্য কিছু যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে সেগুলো করা উচিত। এগুলো গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া থেকে একজনকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণসমূহ কী কী?

WHO ও CDC প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর সর্বাধিক নিয়মিত লক্ষণগুলো নিম্নরুপ ঃ

(ক) জ্বর, ক্লান্তি এবং শুকনো কাশি।

(খ) কিছু রোগীর শরীরে ব্যথা, নাক বন্ধ, সর্দি, গলা ব্যথা বা ডায়রিয়া হতে পারে।

(গ) এই লক্ষণগুলো সাধারণত শুরুতে হালকা হয় এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

(ঘ) কিছু লোক সংক্রামিত হয় তবে তারা কোন লক্ষণ প্রকাশ করে না কিংবা অসুস্থ বোধ করে না (asymptomatic patients)। কিন্তু তারা অন্যদের সংক্রামিত করতে পারে। এদেরকে বাহক বা ক্যারিয়ার বলে।

(ঙ) বেশিরভাগ রোগী (প্রায় ৮০%) বিশেষ চিকিৎসা ছাড়াই রোগ থেকে সেরে ওঠে।

(চ) গড়ে প্রতি ৬ জন রোগীর মধ্যে ১ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তারা শ্বাস নিতে অসুবিধা বোধ করে।

কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন এবং সামাজিক দূরত্বের যথাযথ উদ্দেশ্য ও নিয়মকানুন

কোয়ারেন্টিন কেন?

আপনি যদি কোন কোভিড-১৯ আক্রান্ত এলাকা বা ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে এসে থাকেন এবং ১৪ দিন পার হবার পূর্ব পর্যন্ত সুস্থ থাকেন, তবে হতে পারে- (১) আপনার দেহে ভাইরাসটি প্রবেশ করেছে কিন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেনি, কারণ কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে; অথবা (২) ভাইরাসটি আপনার দেহে আদৌ প্রবেশ করেনি। এক্ষেত্রে আপনি যদি প্রথমটি ধরে নিয়ে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকেন এবং ১৪ দিন পরও সুস্থ থাকেন তবে বুঝবেন আপনার দেহে ভাইরাসটি প্রবেশ করেনি। এক্ষেত্রে প্রথমটি ঘটেছে মনে করার কারণে আপনার ক্ষতি হলো আপনার জীবন থেকে ১৪ টি স্বাধীন দিন চলে যাওয়া। আর আপনি যদি দ্বিতীয়টি ধরে নিয়ে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে না থাকেন এবং ১৪ দিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার অর্থ আপনার দেহে ভাইরাসটি প্রবেশ করেছিল এবং ইতিমধ্যে আপনার দেহ থেকে অন্যদের দেহে তা ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি ঘটেছে মনে করার কারণে আপনার ক্ষতি হচ্ছে আপনার কোন প্রিয়জনের জীবন চলে যাওয়া। এখন সিদ্ধান্ত আপনার, আপনি কি নিজের ১৪টি স্বাধীন দিনের জন্য প্রিয়জনের জীবন উৎসর্গ করবেন, নাকি ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকবেন?

কোয়ারেন্টিন কাদের জন্য?

সাধারণ নিয়মে কোভিড-১৯-এর সম্ভাব্য বিস্তার রোধ করার জন্য কোভিড-১৯ আক্রান্ত এলাকা বা ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে এসেছেন এমন যেকোনো সুস্থ ব্যক্তির জন্য ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকা আবশ্যক। তবে ট্রানজিট সুবিধা থাকার কারণে একটি বিমানে একাধিক দেশের যাত্রী থাকতে পারে। এমন কোন বিমানে যদি যাত্রীদের কেউ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত থেকে থাকে তবে ভ্রমণকালীন সময়ে বিমানের অন্যান্য যাত্রী ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। তাই কোভিড-১৯ এর বিস্তার ঘটেনি এমন দেশ থেকে কেউ আসলেও প্রিয়জনের জীবন ও দেশের স্বার্থে ঐ যাত্রীর ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকা উচিত।

কোয়ারেন্টিনে কীভাবে পালন করতে হবে?

কোয়ারেন্টিন থাকাকালীন সময়ে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে ঃ

১. বাড়ির অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা ঘরে থাকুন।

২. সম্ভব না হলে কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে কোয়ারেন্টিনে থাকুন অথবা একই ঘরে অন্যদের থেকে সর্বদা অন্তত ১ মিটার (৩ ফুট) দূরে থাকুন এবং মাস্ক ব্যবহার করুন।

৩. কাশি, সর্দি, বমি ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক খুলে ফেলুন এবং নতুন মাস্ক ব্যবহার করুন। মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন এবং সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
৪. অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না।
৫. ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন থালা, গ্লাস, কাপ, জামা-কাপড়, তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদি অন্য কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না। এসব জিনিসপত্র ব্যবহারের পর সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলুন।
৬. জ্বর, সর্দি, কাশি বা অন্য কোন উপসর্গ শুরু হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করুন। যদি এমন কোন উপসর্গ শুরু হয় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং আইসোলেশনে থাকুন।

আইসোলেশন কেন, কাদের জন্য এবং কীভাবে?

কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশন এ দু'টি বিষয় আমাদের কাছে একই রকম মনে হলেও এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাব্য বিস্তার রোধ করার জন্য সন্দেহভাজন কিন্তু সুস্থ ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখা হলো কোয়ারেন্টিন। আর অসুস্থ ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখা হলো আইসোলেশন। অন্য কথায়, রোগ ছড়ানোর ভয়ে আক্রান্ত রোগীকে আলাদা ব্যবস্থায় রেখে চিকিৎসা করাকে বলে আইসোলেশন। যেহেতু সাধারণ সর্দি-জ্বরের এবং কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গগুলো একই রকম, তাই SARS-CoV-2 সংক্রমণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের উপসর্গ আছে এমন সকল রোগীকেই আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দিতে হবে এবং SARS-CoV-2 সংক্রমণ সনাক্তের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইসোলেশনের ক্ষেত্রে রোগীকে অবশ্যই আলাদা কক্ষে থাকতে হবে এবং কোয়ারেন্টিনের জন্য প্রযোজ্য নিয়মসমূহ আরও বেশি সতর্কতার সাথে মেনে চলতে হবে।

সামাজিক দূরত্ব কেন এবং কীভাবে পালন করতে হবে?

কোভিড-১৯ এ সংক্রামিত ব্যক্তি যখন কাশি বা হাঁচি দেয় কিংবা কথা বলে, তখন তার নাক ও মুখ থেকে নির্গত করোনাভাইরাস বহনকারী লালা বা রসের অতিক্ষুদ্র কণাগুলো (droplets) তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। করোনাভাইরাস অতি হালকা হলেও করোনাভাইরাস বহনকারী লালার অতিক্ষুদ্র কণাগুলো বাতাসের তুলনায় অনেক ভারি, তাই এগুলো বাতাসে ভেসে ১ মিটার বা ৩ ফিট পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। এ কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখলে অর্থাৎ একজন থেকে আরেক জনের দূরত্ব ৩ ফিটের বেশি হলে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে নির্গত করোনাভাইরাস বহনকারী অতিক্ষুদ্র কণাগুলো নিঃশ্বাসের সাথে সুস্থ ব্যক্তির নাকে প্রবেশ করতে পারে না। তবে তুলনামূলক হালকা কণাগুলো ৩ ফিটের চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত যেতে পারে, বিশেষ করে বন্ধ ঘরে। এ ছাড়া বাতাস প্রবাহের গতি ও দিকের ওপর নির্ভর করে এই দূরত্ব কম বেশি হতে পারে। তবে মাস্ক ব্যবহার করা অবস্থায় কেউ কাশি বা হাঁচি দিলে নির্গত অতিক্ষুদ্র কণাগুলো মাস্কের ভিতর আটকে যায়, ফলে তার চারপাশে বেশি দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে না। একইভাবে, কেউ মাস্ক ব্যবহার করলে তার পাশে কেউ কাশি বা হাঁচি দিলে বাতাসে ভেসে থাকা অতিক্ষুদ্র কণাগুলো সহজে তার নাকে প্রবেশ করতে পারে না। তবে সঠিক সুরক্ষার জন্য অবশ্যই মাস্ক সঠিক নিয়মে পরতে এবং খুলতে হবে।

নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ সনাক্তে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা কী এবং কোথায় করা হয়?

বর্তমানে নভেল করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ সনাক্তে আরটি-পিসিআর বা রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন পলিমেরেজ চেইন রিঅ্যাকশন পরীক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা। জৈব নিরাপত্তা স্তর (বায়োসেফটি লেভেল)-এর নিয়ম অনুযায়ী অতিসংক্রামক জীবাণু যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানবদেহকে সংক্রামিত করতে পারে এমন জীবাণুর নমুনা নিয়ে কাজ করার জন্য বায়োসেফটি লেভেল-৩ (BSL-3) ল্যাব প্রয়োজন (WHO-Biosafety)। যেহেতু নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ঘটে, সেহেতু এর নমুনা নিয়ে কাজ করার জন্য আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য অবশ্যই বায়োসেফটি লেভেল-৩ ল্যাব প্রয়োজন। বায়োসেফটি লেভেল-৩ ল্যাব সাধারণ জনগণের চলাচল কম এমন স্থানে স্থাপন করা হয়। এটি বায়ুরোধী ল্যাব যার ভিতরের বায়ুচাপ বাইরের বায়ুচাপের চেয়ে সর্বদা কম থাকে। ফলে বায়ুপ্রবাহের দিক সর্বদা বাইরে থেকে ভিতরের দিকে থাকে। এ কারণে ল্যাবের ভিতরের দূষিত বাতাস কখনো বাইরে বের হতে পারে না। এই ল্যাবের মূল কক্ষে প্রবেশের জন্য দুই দরজা বিশিষ্ট বায়ুরোধী একটি ছোট কক্ষ ব্যবহার করতে হয়। এই ল্যাবে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশের অনুমতি থাকে। আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, যেমন আরটি-পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে SARS-CoV-2 এর সংক্রমণ সনাক্তের জন্য পিসিআর মেশিন এবং কিট থাকতে হবে । একটি বায়োসেফটি ক্যাবিনেট থাকতে হবে যার মধ্যে সংক্রামক বস্তু নিয়ে সমস্ত কাজ পরিচালিত হবে। এতে হাত ব্যবহার না করে চালানো যায় এমন একটি সিঙ্ক থাকতে হবে। ল্যাবের ভিতরে অটোক্লেভ (autoclave) সুবিধা থাকতে হবে যেন বর্জ্যগুলো বের করার পূর্বে অটোক্লেভ করা যায়।

আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় সন্দেহভাজন রোগীর নমুনায় উপস্থিত SARS-CoV-2 এর আরএনএ দ্বারা কোভিড-১৯ এর সক্রিয় সংক্রমণ সনাক্ত করা হয়। কোভিড-১৯ সনাক্তের জন্যে রোগের উপসর্গ শুরুর প্রথম সপ্তাহেই নাক বা গলার ভিতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো উচিত। কারণ এরপরে ভাইরাসটি নাক ও গলা থেকে ফুসফুসে চলে যায়। ফলে নাক বা গলার ভিতর থেকে সংগ্রহ করা নমুনা (শ্লেষ্মা) ব্যবহার করে রোগটি সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ধাপগুলো নিম্নরূপ (চিত্র-৩) ঃ

১. রোগীর গলা বা নাকের ভিতরে তুলা যুক্ত কাঠি দিয়ে মুছে শ্লেষ্মা (নমুনা) সংগ্রহ করা হয়।

২. ল্যাবে নমুনা থেকে SARS-CoV-2 এর আরএনএ আলাদা ও বিশুদ্ধ করা হয়। এরপর আরএনএ কে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ নামক এনজাইম দিয়ে ডিএনএ তে রূপান্তরিত করা হয়।

৩. এরপর রূপান্তরিত ডিএনএ এর সাথে ডিএনএ-বিল্ডিং এনজাইম, নিউক্লিওটাইড, SARS-CoV-2 এর রূপান্তরিত ডিএনএ এর জন্য নির্দিষ্ট প্রাইমার এবং ফ্লুরেসেন্ট ডাই মিশিয়ে পিসিআর মেশিন চালানো হয়। পিসিআর- এর প্রতি চক্রে ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এদের সাথে ফ্লুরেসেন্ট ডাই যুক্ত হয়। যদি পরীক্ষায় দেখা যায় যে পিসিআর-এর মাধ্যমে ফ্লুরেসেন্ট ডাই যুক্ত ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে ধরে নেওয়া হবে যে ঐ নমুনায় SARS-CoV-2 ছিল। অর্থাৎ রোগী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত। আর যদি তেমন না ঘটে তবে ধরে নিতে হবে ঐ নমুনায় SARS-CoV-2 ছিল না।

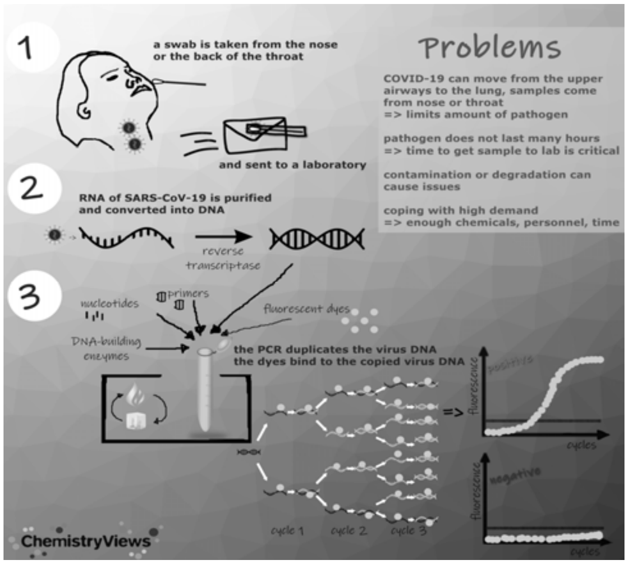

চিত্র ৩: আরটি-পিসিআর পরীক্ষা (উৎস: www.chemistryviews.org)

নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে পিপিই বা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পিপিই (Personal Protective Equipment) বলতে এমন প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামসমূহকে বুঝায় যা পরিধানকারীর দেহকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে এবং তাদের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণের বিস্তার রোধে ভুমিকা রাখবে। তবে স্বাস্থ্য কর্মীরা কি ধরনের পিপিই ব্যবহার করবেন তা নির্ভর করবে রোগীর সংক্রমণের ধরনের উপর। যেমন কোভিড-১৯ এর মতো বায়ুবাহিত উচ্চ সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য পিপিই-তে চোখ, নাক ও মুখের সুরক্ষার জন্য থাকবে N-৯৫ বা তার চেয়ে ভালো মানের মাস্ক এবং গগলস বা ফেসশিল্ড, এবং দেহের অন্যান্য অংশের সুরক্ষার জন্য থাকবে মাথার আচ্ছাদন, গাউন/অ্যাপ্রন বা কভারঅল, গ্লাভ্‌স ও জুতার আচ্ছাদন।

পিপিই ব্যবহারে ভুলগুলো কী কী?

পিপিই কীভাবে পরতে এবং খুলতে হবে, এবং পিপিই পরিহিত অবস্থায় কি করা যাবে আর কি করা যাবে না সে বিষয়ে WHO নির্ধারিত নিয়ম-কানুন রয়েছে। তবে স্বাস্থ্য কর্মীরা এসব নিয়ম-কানুন জানলেও নিয়মিত চর্চা না থাকায় ভুল করেন। অনেক সময় সঠিক নিয়মে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বেই নিজেকে সংক্রমিত করেন। পিপিই পরিহিত অবস্থায় স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রায়শ ভুলে যান যে, কোভিড-১৯ বিস্তারের ক্ষেত্রে সংক্রামিত ব্যক্তি আর ভাইরাস দ্বারা দূষিত পিপিই দু'টিই সমান বিপদজনক। তাই কোভিড-১৯ রোগীর সেবাদান শেষে কোন স্বাস্থ্য কর্মী যদি সংরক্ষিত (আইসোলেশন ওয়ার্ড বা কক্ষ) এলাকার বাইরে বের হতে চান,

তবে অবশ্যই যথাযথ নিয়মে পিপিই খুলে নির্ধারিত স্থানে রাখতে হবে এবং নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বের হতে হবে। পুনরায় সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করতে চাইলে অবশ্যই নতুন বা অটোক্লেভকৃত পিপিই ব্যবহার করতে হবে। আর যদি তা না করেন তবে প্রশ্ন একটাই, "করোনাভাইরাস থেকে পিপিই আপনাকে রক্ষা করলেও পিপিই থেকে আপনাকে বা আপনার কাছের মানুষদেরকে রক্ষা করবে কে?"

পিপিই-এর ভুল ব্যবহার কীভাবে করোনাভাইরাসের বিস্তারে ভুমিকা রাখতে পারে, তা বুঝতে আমরা কোভিড-১৯ রোগীর হাঁচি বা কাশিকে একটি সেন্ট বা পারফিউমের স্প্রের সাথে তুলনা করতে পারি। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই বাতাসে তরল পদার্থের অসংখ্য অতিক্ষুদ্র কণা ছড়িয়ে পড়ে। এবার ভেবে দেখুন, কেউ যদি পারফিউম ব্যবহার করে আপনার কাছাকাছি চলে আসে, তবে আপনি সুঘ্রাণ পান, এর অর্থ হলো তার পোশাক থেকে পারফিউমের ক্ষুদ্র কণা আপনার নাকে পৌঁছেছে। ঠিক একইভাবে কোভিড-১৯ রোগীর হাঁচি বা কাশি দ্বারা দূষিত পিপিই পরিহিত অবস্থায় কেউ যদি আপনার কাছাকাছি চলে আসে তবে হাঁচি বা কাশির অতিক্ষুদ্র কণা আপনার নাকে পৌছাতে পারে কিন্তু এর গন্ধ না থাকায় বুঝতে পারবেন না। একইভাবে হাতে পারফিউম ব্যবহার করে কোন কিছু স্পর্শ করে রেখে দেবার কিছুক্ষণ পর তা যদি অন্য কেউ স্পর্শ করে, তবে তার হাতেও পারফিউমের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। ঠিক তেমনিভাবে কোভিড-১৯ রোগীর হাঁচি বা কাশি দ্বারা দূষিত গ্লাভ্স দিয়ে কিছু স্পর্শ করে রেখে দেবার কিছুক্ষণ পর তা যদি অন্য কেউ স্পর্শ করে, তার হাতেও করোনাভাইরাস পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক স্বাস্থ্য কর্মী ভুলে যান যে কোভিড-১৯ রোগীর হাঁচি বা কাশি দ্বারা দূষিত পিপিই পরিহিত অবস্থায় যেসব জিনিসপত্র তিনি স্পর্শ করেছেন তা পিপিই না পরে স্পর্শ করা যাবে না বা যারা পিপিই পরে নি তাদের সংস্পর্শে আনা যাবে না। এমনিভাবে সনাক্তকৃত কোভিড-১৯ রোগীর সেবাদান শেষে পিপিই পরিবর্তন না করে সন্দেহভাজন কোন রোগীকে সেবা দেওয়া যাবে না।

করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুজব বা অতিকথা

সামাজিক গণমাধ্যম যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, e-Mm ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন গুজবে কান দিয়ে অনেকে অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ে, ফলে কোয়ারেন্টিন ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়কে অবহেলা করে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত অনেকে আবার গুজবে কান দিয়ে নিজের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়কে গোপন রাখেন বা ভয়ে হাসপাতাল ও বাড়ি থেকে পলায়ন করেন। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত অনেকে আবার সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুল চিকিৎসা নিজের উপর প্রয়োগ করেন। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুজব এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

গুজব ১: বিভিন্ন স্থান যেমন বিমান বন্দরে স্থাপিত থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত লোকদের সনাক্ত করা যায়।

প্রকৃত ঘটনা: নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ বা অন্য কোন কারণে যাদের জ্বর হয়েছে অর্থাৎ শরীরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা রয়েছে, তাদের সনাক্তকরণে থার্মাল স্ক্যানারগুলো কার্যকর। তবে, থার্মাল স্ক্যানার জ্বরে আক্রান্ত নয় এমন কোভিড-১৯ সংক্রামিত লোকদের (asymptomatic patients) সনাক্ত করতে পারে না। কারণ কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অসুস্থ হতে এবং জ্বরে আক্রান্ত হতে ২ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগে।

গুজব ২: কোভিড-১৯ এ আক্রান্তরা সুস্থ হন না বা সুস্থ হলেও তার কাছে করোনাভাইরাস থাকে।

প্রকৃত ঘটনা: কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত বেশিরভাগ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যান এবং তাদের শরীর থেকে ভাইরাসটি নির্মূল করতে পারেন। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত মানে এই নয় যে তার শরীরে করোনাভাইরাস সারাজীবন থাকবে।

গুজব ৩: কাশি বা অস্বস্তি বোধ না করে ১০ সেকেন্ড বা তারও বেশি সময় ধরে যদি আপনার শ্বাস ধরে রাখতে পারেন, তবে আপনি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত নন।

প্রকৃত ঘটনা: কোভিড-১৯ এর সর্বাধিক সাধারণ লক্ষণগুলো হলো শুকনো কাশি, ক্লান্তি এবং জ্বর। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে আরও মারাত্মক লক্ষণ যেমন নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। কোভিড-১৯ এর ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কি-না তা নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে পরীক্ষাগারে আপনার নমুনা পরীক্ষা করা। শ্বাস ধরে রাখার এই পরীক্ষা দ্বারা এটি আপনি নিশ্চিত করতে পারবেন না, বরং এটি ক্ষেত্রবিশেষে বিপজ্জনকও হতে পারে।

গুজব ৪: ৫ জি মোবাইল নেটওয়ার্ক কোভিড-১৯ ছড়িয়ে দেয়।

প্রকৃত ঘটনা: করোনাভাইরাস রেডিও তরঙ্গ বা মোবাইল নেটওয়ার্ক -এ ভ্রমণ করতে পারে না। এমন অনেক দেশে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়েছে যাদের ৫ জি মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। যখন সংক্রামিত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচি দেয় বা কথা বলে, তখন তার

নাক ও মুখ থেকে নির্গত দেহ রসের অতিক্ষুদ্র কণার মাধ্যমে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া, এমন অতিক্ষুদ্র কণা দ্বারা দূষিত পৃষ্ঠ স্পর্শ করার পর চোখ, মুখ বা নাক স্পর্শ করেও লোকেরা সংক্রমিত হতে পারে।

গুজব ৫: মদ বা অ্যালকোহল পান করলে কিংবা এর বাষ্প গ্রহণ করলে কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
প্রকৃত ঘটনা: ঘন ঘন বা অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করা বা এর বাষ্প গ্রহণ করা বিপজ্জনক হতে পারে। এটি আপনার স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

গুজব ৬: নিয়মিত গরম পানিতে স্নান/গোসল করলে কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
প্রকৃত ঘটনা: নিয়মিত গরম পানিতে গোসল করার অভ্যাস আপনাকে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আপনার গোসলের বা ঝরনার পানির তাপমাত্রা যাই হোক না কেনো এতে আপনার শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না, এটি ৩৬.৫ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। আসলে, অত্যন্ত গরম পানি দিয়ে গোসল করা ক্ষতিকারক হতে পারে, কারণ এতে আপনার শরীরের চামড়া ক্ষতিগ্রস্থ বা পুড়ে যেতে পারে।

গুজব ৭: সারা শরীরে অ্যালকোহল বা ক্লোরিন স্প্রে করলে করোনাভাইরাস মরে যায়।
প্রকৃত ঘটনা: সারা শরীরে অ্যালকোহল বা ক্লোরিন স্প্রে করে ইতিমধ্যে শরীরে প্রবেশ করেছে এমন ভাইরাসকে মেরে ফেলা যায় না। এই জাতীয় পদার্থ স্প্রে করলে দেহের বাইরের ভাইরাস মরবে তবে এটি কাপড়, চোখ, মুখ ও শ্লেষ্মা ঝিল্লির জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই সচেতন থাকুন, কোনও বস্তুর পৃষ্ঠতল জীবাণুমুক্ত করতে অ্যালকোহল এবং ক্লোরিন উভয়ই কার্যকর, তবে এগুলো যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা দরকার।

গুজব ৮: রসুন খেলে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হয় না।
প্রকৃত ঘটনা: রসুন একটি স্বাস্থ্যকর খাবার যাতে কিছু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তবে, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে রসুন খাওয়ার মাধ্যমে মানুষ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে।

গুজব ৯: জনসাধারণের মাঝে থাকা অবস্থায় রাবার গ্লাভ্স ব্যবহার করে নভেল করোনভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।
প্রকৃত ঘটনা: না, হাতে রাবার গ্লাভ্স পরার চেয়ে সাবান-পানি দিয়ে হাত ঘন ঘন পরিষ্কার করলে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ থেকে বেশি রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, ভাইরাস দ্বারা রাবার গ্লাভ্স দূষিত হয়ে পড়লে তা থেকে আপনি নিজেই সংক্রমিত হতে পারেন। আপনি যদি দূষিত গ্লাভ্স দিয়ে আপনার নাক বা মুখ স্পর্শ করেন, তবে ভাইরাস আপনার নাক বা মুখে প্রবেশ করবে এবং আপনাকে সংক্রমিত করবে। মনে রাখতে হবে, নভেল করোনাভাইরাস হাতের চামড়া দিয়ে আপনার দেহে প্রবেশ করে না। তাই সাবান-পানি দিয়ে হাত পরিষ্কার করার সুযোগ থাকলে রাবার গ্লাভ্স ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ রাবার গ্লাভ্স নিয়মিত ব্যবহার করলে অনেকের হাতে অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে।

তথ্যসুত্র:

Hasöksüz, M., Kiliç, S. and Saraç, F. 2020. Coronavirus and SARS-CoV-2. *Turkish J. Med. Sci.* **50**: 549-556.

Jiang, S., Shi, Z., Shu, Y., Song, J., Gao, G.F., Tan, W. and Guo, D. 2020. A distinct name is needed for the new coronavirus. *Lancet* **395**(10228): 949.

Lauer, S.A., Grantz, K.H., Bi, Q., Jones, F.K., Zheng, Q., Meredith, H.R., Azman, A.S., Reich, N.G. and Lessler, J., 2020. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: Estimation and application. *Ann. Intern. Med.* **172**: 577-582.

Li, F. 2016. Structure, function, and evolution of coronavirus spike proteins. *Ann. Rev. Virol.* **3**: 237-261.

Schoeman, D. and Fielding, B.C. 2019. Coronavirus envelope protein: current knowledge. *Virol. J.* **16**(1): Article No. 69.

Zhang, H., Penninger, J.M., Li, Y., Zhong, N. and Slutsky, A.S. 2020. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target. *Intensive Care Med.* **46**(4): 586-590.

Zhang, T., Wu, Q. and Zhang, Z., 2020. Probable pangolin origin of SARS-CoV-2 associated with the COVID-19 outbreak. *Curr. Biol.* **30**(7): 1346-1351.

Zhou, P., Yang, X.L., Wang, X.G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., Si, H.R., Zhu, Y., Li, B., Huang, C.L. and Chen, H.D. 2020. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature* **579** (7798): 270-273.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

https://www.chemistryviews.org/details/ezine/11232602/COVID-19_Specific_Testing.html

https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/westernpacific/news/multimedia/infographics/covid-19

বিভাগীয় মিউজিয়াম: দর্শনার্থীদের চোখে

ড. আনজুমান আরা আলী
ডেপুটি মিউজিয়াম কিউরেটর

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় তলায় উত্তর-পশ্চিম কোণের ২১৯-ঙ কক্ষে স্থাপিত ও ক্রমবর্ধিষ্ণু *'প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়াম'* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা সারা বাংলাদেশের একটি সুবৃহৎ ও আধুনিক প্রাণী মিউজিয়াম। বিভাগের প্রতিষ্ঠা লগ্ন ১৯৭২ সালে স্থাপিত এই মিউজিয়ামটিতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৪৭৩টি প্রজাতির সর্বমোট ১,৩৪৪টি নমুনা সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত রয়েছে। এখানে পুরাতন পদ্ধতিতে স্টাফকৃত নমুনার সংখ্যা ২০৫টি; আধুনিক (ট্যাক্সিডার্মি) পদ্ধতিতে স্টাফকৃত পাখী ও স্তন্যপায়ী নমুনার সংখ্যা ৮৫টি; অবশিষ্ট সিংহভাগ নমুনা ১০-১৫% ফরমালিনে সংরক্ষিত। মিউজিয়ামে ১৯ প্রজাতির প্রবাল (৩৩টি নমুনা), নানা প্রজাতির অসনাক্তকৃত কাঁকড়া, ৪৫টি সনাক্তকৃত শামুকের খোলকসহ মোট অমেরুদন্ডী প্রাণীর প্রজাতি সংখ্যা ১১০ (৩৮৫টি নমুনা)। ২২২ প্রজাতির ৬২৮টি মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মাছ, তন্মধ্যে স্থানীয় ৯৮ প্রজাতির মিঠাপানির মাছসহ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী সমন্বয়ে মোট মেরুদন্ডী প্রাণীর প্রজাতি সংখ্যা ৩৫৮ (৯৫১টি নমুনা)। তা ছাড়া, ৫টি মাইনর ফাইলার ৮টি নমুনা, দুষ্প্রাপ্য ও বিদেশ থেকে সংগৃহীত ১৪২টি জীবাশ্মের নমুনা এবং দুটি সম্পূর্ণ মানব কঙ্কাল রয়েছে, যার বিশদ তথ্যাদি ইতিপূর্বে *প্রবাল* ৩২ সংখ্যায় (ডিসেম্বর ২০১৭) প্রকাশিত হয়েছে।

বিভাগের সভাপতি কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তির পূর্বানুমতি, ক্ষেত্র বিশেষে তাৎক্ষণিক অনুমতি নিয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে দর্শনার্থীবৃন্দ মিউজিয়ামটি প্রবেশ ফীবিহীন, সম্পূর্ণ ফ্রী পরিদর্শন করতে পারেন। মিউজিয়ামটি ২০১৫-১৬ সালে আধুনিকায়নের পর দর্শনার্থীদের জ্ঞাতার্থে রাজশাহী বিভাগসহ উত্তরাঞ্চলের মোট ৭৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিউজিয়াম পরিদর্শনের আহ্বান সম্বলিত চিঠি পাঠানো হয়। বিগত ছয় বছরের (২০১৫-২০২০) মিউজিয়াম দর্শনার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী, যেখানে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ও তথ্যাদি রয়েছে, সারণি ১-এ উপস্থাপিত হলো।

সারণি ১. গত পাঁচ বছরে বিভাগীয় **প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়াম** দর্শনার্থীদের পরিসংখ্যান।

সময়কাল ও মোট দর্শনার্থী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংগঠন/পেশাজীবী	সংখ্যা (জন)
০৭-০২-২০১৫ থেকে ২৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত = ১,৪৭২ জন	স্কুল ও মাদ্রাসা	৩১১
	কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ	৫২৯
	বিশ্ববিদ্যালয়	১২
	বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থী/দর্শনার্থী	৬০
	রাবি অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থী	৩২১
	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (HSTTI)	১০৪
	বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কমিটি, রাজশাহী	১০২
	রাবি শিক্ষক	৩০
	রাবি গবেষক	৩
২৫-০৬-২০১৬ থেকে ০৩-১০-২০১৭ পর্যন্ত = ১,৮৫৫ জন	স্কুল ও মাদ্রাসা	৩৪২
	কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ	৭৮০
	বিশ্ববিদ্যালয়	৩৩
	বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থী/দর্শনার্থী	৩৪
	বিশেষ দর্শনার্থী ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী; মহাপরিচালক ইত্যাদি	২৭
	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (HSTTI)	৫৬
	রিলেটেড বিষয়ের রাবি শিক্ষার্থী	৮৪
	রাবি অন্যান্য বিভাগ থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	৪৬৯
	শিক্ষক দর্শনার্থী	১৩০
০৫-১০-২০১৭ থেকে ২৭-০৬-২০১৮ পর্যন্ত = ২,০৫৫ জন	স্কুল ও মাদ্রাসা	৯১০
	কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ	৩৫৫
	বিশ্ববিদ্যালয়	১৭
	বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থী/দর্শনার্থী	১০০
	বিশেষ দর্শনার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও রাবি উপাচার্য	১৬
	কাশ্মীর, ভারত থেকে শিক্ষক ও রাবি সহকর্মী	৮
	অফিসার, আইএফআইসি ব্যাংক, রাজশাহী	৩
	রাবি অন্যান্য বিভাগ থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	৬৪০
	বিশেষ দর্শনার্থী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট	৩

০৪-১০-২০১৮ থেকে ৩০-১০-২০১৯ পর্যন্ত = ১,৯৩৩ জন	স্কুল ও মাদ্রাসা	৪৪৪
	কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ	২৪৫
	বিশ্ববিদ্যালয়	৪২
	বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থী/দর্শনার্থী	২৩২
	বিশেষ দর্শনার্থী, রাবি অন্য বিভাগের শিক্ষক ও আত্মীয়	৪৫
	রাবি অন্যান্য বিভাগ থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	৯০৮
	রাবি শিক্ষক পরিবার বন্ধুসহ	১৪
	প্রাণিবিদ্যার প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও পরিবার	৩
০১-১১-২০১৯ থেকে ১৭-০৩-২০২০ পর্যন্ত = ৮৩২ জন	স্কুল ও মাদ্রাসা	২৮২
	কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ	২৫২
	বিশ্ববিদ্যালয়	৫
	রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থী/দর্শনার্থী	৫১
	অন্যান্য দর্শনার্থী	৬২
	রাবি অন্যান্য বিভাগ থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	১৬৪
	রাবি শিক্ষক ও অন্যান্য	১৬
০৭/০২/২০১৫-১৭/০৩/২০২০	মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা	৮,১৪৭ জন

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এবং বিগত দশক পর্যন্ত (২০০৫-২০১৫) বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাসফরে গিয়ে প্রচুর সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতো, যেগুলো মিউজিয়ামের নমুনা সংগ্রহ/সংরক্ষণ তালিকাকে ক্রমশ সমৃদ্ধশালী করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু বর্তমানে, বিশেষ করে বিভাগীয় মিউজিয়ামটির আধুনিকায়নের পর, বিগত পাঁচ-ছয় বছরে (২০১৫-২০২০) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করা যায় নি, যার অন্যতম কারণ হিসেবে প্রকৃতিতে নমুনার দুষ্প্রাপ্যতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তদুপরি, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিভিন্নজনের অনুদানের মাধ্যমে যে সব নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা (সারণি ২) নিচে দেয়া হলো।

সারণি ২. বিভাগীয় মিউজিয়ামে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে সংগৃহীত নমুনার তালিকা।

প্রাণীর পর্ব/শ্রেণি	প্রাণীর গণ/নমুনা
অমেরুদন্ডী; অ্যানিলিডা	*Pheretima, Hirudo*
অমেরুদন্ডী; সন্ধিপদী	*Buthus, Julus, Luciola,* Firefly
অমেরুদন্ডী; মলাস্কা	*Unio, Pila, Dentalium, Helix*
অমেরুদন্ডী; ইকাইনোডার্মাটা	*Asteropecten, Temnopleurus*
মেরুদন্ডী; উভচর	*Hoplobatrachus, Fejervarya, Gekko, Chiromantis, Limnonectes*
মেরুদন্ডী; মাছ	*Myxine, Mustelus, Gonialosa, Sisor*
মেরুদন্ডী; পাখি	*Accipiter, Nettapus, Phalacrocorax, Tyto, Anas, Tadorna, Coracias, Nycticorax,Corvus*
মেরুদন্ডী; স্তন্যপায়ী	*Funumbulus, Trachypithecus, Rattus, Cavia,* Human skeleton

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর ড. রেজিনা লাজের নেতৃত্বে গত বছর নভেম্বর ২০১৯-এ ১ম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীরা দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষাসফর শেষে মিউজিয়ামে জমা দানকৃত নমুনাসমূহ নিচের সারণি ৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩. বিভাগীয় মিউজিয়ামে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত নমুনার তালিকা।

পর্ব ও প্রাণীর শ্রেণি/বর্গ	প্রাণীর নমুনা/গণ
অমেরুদন্ডী; নিডেরিয়া	*Gorgonia, Aurelia*
অমেরুদন্ডী; সন্ধিপদী	*Cancer*
অমেরুদন্ডী; মলাস্কা	*Octopus, Sepia, Loligo, Chiton, Aplysia.* lot of mulluscan shells
অমেরুদন্ডী; ইকাইনোডার্মাটা	*Thyone, Cucumaria*
মেরুদন্ডী; মাছ	*Scoliodon, Trygon, Synaptura, Cynoglossus*

এবার মিউজিয়াম সম্পর্কীত দর্শনার্থীদের কিছু উল্লেখযোগ্য মতামত/মন্তব্য/পরামর্শ পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিচে তুলে ধরছি।

১. তত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষাভ্রমণের মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান হিসেবে সহায়ক ভূমিকা রাখবে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের এই মিউজিয়াম, যেটি উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রেরণা যোগাবে। -জোৎস্না খাতুন, রাবি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, রাজশাহী। ১৯ মে, ২০১৪।

২. প্রাণীবৈচিত্র্যের বিশাল ভান্ডার! কৃত্রিমভাবে প্রাণী সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবেশে সংরক্ষণের আব্দার জানাই। -ড. মো. শফিউল কাফী, সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জয়পুরহাট সরকারী কলেজ। ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬।

৩. 'Let us try to voice the voice of the voiceless' আসুন আমরা নিজেরা বাঁচি এবং পরিবেশের অন্যান্য জীবদের বাঁচিয়ে রাখি।-প্রফেসর ড. মো. আব্দুল মজিদ, নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। ৩ এপ্রিল, ২০১৭।

৪. বিজ্ঞানের যুগে সবই সম্ভব। একসাথে অনেক প্রাণীর সমাহার মুগ্ধ করেছে। সপরিবারে এসে আনন্দ এক অনুভূতি। বার বার আসবার ইচ্ছা। ক্লাস বাদে অন্য সময়ে জেনারেটরের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। অধিক প্রচার ও প্রসার হোক কামনায় -প্রফেসর মো. হামিদুল হক, মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ১ জুলাই, ২০১৭।

৫. সৃষ্টির অংশ হিসেবে নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়ে সবাই যেন নিজেকে বিচার করে। শিবলী শিহাব। ২ জানুয়ারী, ২০১৮।

৬. দেখলাম। অপূর্ব সুন্দর ও উন্নত। -ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮।

৭. জায়গার অভাবে (নমুনাগুলো) ঠাসাঠাসি করে রাখায় ভাল করে দেখতে না পারার আক্ষেপ। Minor phyla থেকে সংগ্রহ করে রাখার অনুরোধ। বৈচিত্র্যময় প্রাণীর সংগ্রহ ও তা' সংরক্ষণের তৎপরতা প্রশংসার দাবীদার।-নাদিরা আক্তার, আলফিকাহ্ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) শেখ জামাল আখতার (প্রাক্তন ছাত্র) ও মো. শামসুল আলম, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

৮. সব বয়সী শিক্ষার্থীদের মিউজিয়ামে প্রবেশের সুযোগ অতুলনীয়। তবে ছোটবেলা থেকে এ সব ল্যাব বা মিউজিয়ামে স্কুলের মাধ্যমে আসার সুযোগ চাই। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গবেষণা সহজ ও সুশ্রী হবে ইনশাল্লাহ্। শেখ মোত্তহির রহমান ও মো. রিদওয়ান রহমান, খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা। ১১ মার্চ, ২০১৯।

৯. পরিবেশ সুন্দর। তবে আরও সুবিন্যস্তভাবে এবং প্রাণীদ্বারা আরো সমৃদ্ধিশালী মিউজিয়াম, যাকে বলে আধুনিক মিউজিয়াম, দেখতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।-মো. মোসলেম, হাটগাঙ্গোপাড়া, বাঘমারা, রাজশাহী। ৭ জানুয়ারী, ২০২০।

১০. না দেখা অনেককিছু দেখে মনে হচ্ছে পুকুর থেকে সমুদ্রে প্রবেশ করেছি। অনেক অনুপ্রাণিত হলাম। আরো বেশী জানার জন্য এখানে পড়তে চাই।-শামসুল, আমলা সরকারী কলেজ, মিরপুর. কুষ্টিয়া। ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০।

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ও মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দূর্লভ প্রজাতির পাঁচটি নমুনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে বিবৃত হলো।

(ক) পলিপটেরাস বিচির (*Polypterus bichir*, Nile bichir): এটি একটি স্বাদুপানির তলভোজী মাছ, যা নীল নদ ও আফ্রিকার কয়েকটি উপনদীতে পাওয়া যায়। আদি (primitive) প্রকৃতির এই মাছটিকে কিছু বিজ্ঞানী 'জীবন্ত জীবাশ্ম' (living fossil) হিসেবে বিবেচনা করেন, কারণ এর দেহে গ্যানয়েড (ganoid) ধরনের আঁশ ও শ্বাসনালীবিহীন ফুসফুস বিদ্যমান। এদের দেহে মাছ ও উভচর প্রাণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(খ) অ্যামিয়া কালভা (*Amia calve*, bowfin): এটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মিঠাপানির একটি আক্রমনাত্মক শিকারী মাছ। দিনে এরা গভীর পানিতে বসবাস করলেও রাতে শিকারের সন্ধানে অগভীর পানিতে চলে আসে। কস্‌ময়েড (cosmoid) ধরনের আদি আঁশবিশিষ্ট এই মাছের ধনুকসদৃশ পৃষ্ঠ পাখনার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে মাছটির নামকরণ বোফিন করা হয়েছে।

(গ) কাইমিরা (*Chimaera*, rat fish): এটি একটি গভীর জলের সামুদ্রিক মাছ, যার নিকটতম আত্মীয় হচ্ছে হাঙ্গর ও সঙ্কর মাছ (ray fish)। এদের কঙ্কাল তরুণাস্থিযুক্ত; দেহ দীর্ঘ (৬০-২০০ সে.মি.) এবং বড় মাথা ও চোখযুক্ত দাঁতাল চেহারা ইঁদুর কিংবা খরগোসসদৃশ হওয়ায় এরা র‌্যাট ফিশ এবং র‌্যাবিট ফিশ নামে সমধিক পরিচিত।

(ঘ) ফ্লাইং ফিশ বা উড়ুক্কু মাছ (*Exocetus volititaus*, flying fish): ব্যতিক্রমধর্মী বড় ও শক্তিশালী পাখনাসমৃদ্ধ সামুদ্রিক এই মাছ পানিপৃষ্ঠের উপরে দীর্ঘ সময় ও দূরত্বে উড়ে যেতে সক্ষম। সাগরের নীল জলরাশির উপর ঝাঁকে-ঝাঁকে এই মাছ 'উড়তে' দেখা যায়। মূলতঃ শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে এদের পানির উপরে বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে চলার দৃশ্যটি অত্যন্ত মনমুগ্ধকর।

(ঙ) ঘোড়া মাছ (*Hippocampus kuda*, horse fish): দেহের সামনের অংশ দেখতে ঘোড়ার মতো আর পেছনের বাঁকানো লেজ মাছটিকে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আঁশ ও দাঁতবিহীন এই মাছের সারা দেহ পাতলা চামড়ার রিং দিয়ে আবৃত। মাছটি পৃষ্ঠীয় পাখনা ঝাপটিয়ে খাড়াভাবে ধীর ছন্দময় ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। এরা বাঁকানো লেজের সাহায্যে সামুদ্রিক আগাছা ও শৈবালের সাথে জড়িয়ে থেকে নিজেকে মানিয়ে গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে। ঘোড়ামাছের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পুরুষেরা 'বাচ্চা থলি' বা brood pouch বহন করে, যেখান থেকে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে।

প্রবন্ধটির পরিকল্পনা ও অনুলিখন: প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ৬২০৫।
টেলিফোন: (০৭২১) ৭১১১১৯
ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
ই-মেইল : zoology@ru.ac.bd
Website : http://www.ru.ac.bd/zoology/

প্রাণিবিদ্যা বিভাগে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ

বিভাগ : প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি।
সভাপতি : প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম (১৪-০৫-২০১৮ থেকে)।
শিক্ষকমন্ডলী (কর্মরত) :

প্রফেসরবৃন্দ

এম. সাইফুল ইসলাম (১৯৮৩-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), এম. এস-সি (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পি-এইচ. ডি (রেডিং, যুক্তরাজ্য), কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলো (অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য), ভিজিটিং ফেলো (কেন্টাকী, যুক্তরাস্ট্র), প্রাক্তন ফেলো, রয়াল কীটতত্ব সমিতি (লন্ডন), ফেলো, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, আঞ্চলিক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি (২০০৫-০৬), জীবন সদস্য, বাংলাদেশ জীনতত্ব সমিতি, বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি ও বাংলা একাডেমি, প্রাক্তন সদস্য, আমেরিকা বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি; সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি (২০১৮-); জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি, জীবপরিসংখ্যান, আপদ প্রাণীর জীনতাত্বিক নিয়ন্ত্রণ, গবাদি পশুর পরিমানগত বৈশিষ্ট্য ও মানব জীনতত্ব অধ্যয়ন।

বিধান চন্দ্র দাস (১৯৮৯-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), পি-এইচ. ডি (কল্যাণী, ভারত), কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো (নরউইচ), যুক্তরাজ্য), ভিজিটিং ফেলো (ব্যঙ্গুর, যুক্তরাজ্য), লিংক কোর্ডিনেটর, দ্বিপাক্ষিক (যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ, ২০০৮-২০১০, জার্মানি-বাংলাদেশ, ২০১৩-২০১৬), বহুপাক্ষিক (যুক্তরাজ্য-ঘানা-বাংলাদেশ, ২০০৯-২০১২), প্রশাসক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাবি (২০১০-২০১৩), কলেজ পরিদর্শক, রাবি (২০১৩-২০১৭), ফেলো, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশে বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি, বাংলা একাডেমী, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, এ্যাফিডোলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া; কনজারভেশন বায়োলজি ও ক্লাইমেট চেঞ্জ, আইপিএম, সিস্টেমেটিকস।

মো. মাহবুব হাসান (১৯৮৯-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), পি-এইচ. ডি (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (বার্লিন, জার্মানি), ভিজিটিং ফেলো (সুকুবা, জাপান), ভিজিটিং ফেলো (ক্যান্সাস, যুক্তরাস্ট্র), সাধারণ সম্পাদক, রাবি শিক্ষক সমিতি (২০০৬-০৮); অমেরুদন্ডি গঠন ও কার্যকারীতা, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বায়োলজি ও গুদামজাত পণ্য সংরক্ষণ কৌশল।

এম. নজরুল ইসলাম (১৯৯১-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), এম. ফিল (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পি-এইচ. ডি (রাবি), সিন্ডিকেট সদস্য, রাবি (১৯৯৯-২০০০), রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), রাবি (২০১৩); ডীন, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান অনুষদ, রাবি (২০১৮-); জুকিপিং, ফিশারিজ ও ম্যালাকোলজি।

মো. হাবীবুর রহমান (১৯৯১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), পি-এইচ. ডি (ইহিমে, জাপান), এসটিএ পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (ইহিমে, জাপান), পোস্ট-ডক্টোরাল রিসার্চ (National Research Institute of Aquaculture, জাপান ২০০৪-০৮), ভিজিটিং প্রফেসর (ইবারাকি, জাপান (২০১০-১২), সিনেটর, রাবি (২০১৬-),সিন্ডিকেট সদস্য (প্রফেসর ক্যাটাগরি), রাবি (২০১৮-); Section Reviewer (Frontier Microbiology & Chemotherapy), জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, সদস্য, বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি; মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি ও প্যারাসাইটোলজি, প্রাণী পরিচিতি ও শ্রেণীবিন্যাসতত্ব, মাছের রোগ, বাস্তুতন্ত্র ও পুকুর ব্যবস্থাপনা।

মো. সাইফুল ইসলাম ফারুকী (১৯৯৪-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি), জেএসপিএস পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (সুকুবা, জাপান), সিন্ডিকেট সদস্য, রাবি (১৯৯৭-১৯৯৮), প্রাধ্যক্ষ, শহীদ হবিবুর রহমান হল, রাবি (২০০৮-০৯), ডীন, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদ, রাবি (২০১৬-২০১৮), জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি; প্রাণীর গঠন ও কার্যকারীতা, আপদ প্রাণীর ব্যবস্থাপনা, গুদামজাত পণ্য সংরক্ষণ কৌশল ও সমন্বিত বালাই দমন।

মোহা. মাইনুল হক (১৯৯৪-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি), জেএসপিএস পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (জাপান), প্রশাসক, কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া, রাবি (২০১২-১৪), প্রশাসক, পরিবহন, রাবি (২০১৫-১৭); বাস্তুতত্ত্ব, মাকড়তত্ত্ব ও জীব শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্ব।

মো. গোলাম মোর্ত্তুজা (১৯৯৪-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, এম. ফিল (রাবি), ডি. এস-সি (হিরোশিমা, জাপান), প্রাধ্যক্ষ, আমীর আলী হল, রাবি, পোস্ট-ডক্টোরাল পজিশন (পুশান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, দঃ কোরিয়া), প্রফেসর (কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব); ফিশারিজ বায়োলজি ও ব্যবস্থাপনা এবং ফ্লাড প্লেইন ফিশারিজ।

আমিনুজ্জামান মো. সালেহ রেজা (১৯৯৭-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি), জেএসপিএস পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (সুকুবা, জাপান); বায়োইনফর্মেটিক্স, হেল্‌থ বায়োলজি, রেশম জীনতত্ত্ব ও মলিকিউলার বায়োলজি, পাখির বাস্তুসংস্থান ও আচরণ অধ্যয়ন।

রেজিনা লাজ (১৯৯৭-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি), প্রাধ্যক্ষ, মন্নুজান হল, রাবি (২০০৭-২০০৯); প্রাণীর প্রটেকশন, সাপোর্ট ও মুভমেন্ট, ইমিউনোজেনেটিক্স ও জীন প্রকৌশল, রেশমের জীনতত্ত্ব ও আপদ পতঙ্গের জীনতাত্ত্বিক দমন কৌশল।

মো. নূরুল ইসলাম (১৯৯৭-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি), এসটিএ পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (আওমোরি গ্রীনবায়োসেন্টার, জাপান), পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (লোজান, সুইজারল্যান্ড); জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি, সদস্য, বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, সদস্য, আমেরিকান সোসাইটি অব ফার্মাকগনেসি, সদস্য, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব ফাইটোকেমিস্ট্রি, সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাচারাল প্রোডাক্টস, সদস্য, প্লান্ট ডিজিজ বায়োকন্ট্রোল এ্যান্ড বায়োটেকনোলজি সোসাইটি, জাপান; খন্ডকালীন শিক্ষক, জাপানী ভাষা কোর্স, রাবি, রোভার স্কাউট লিডার, রাবি; ক্রপ প্রোটেকশন ও জীবতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় প্রাকৃতিক উপাদানের ইকোলজি।

নুজহাত আরা (১৯৯৭-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), এম. এস-সি (ঘেন্ট, বেলজিয়াম), রিসার্চ ফেলো (ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাস্ট্র); অমেরুদন্ডি প্রাণীর গঠন ও কার্যকারীতা ও কীটতত্ত্ব।

মো. কামরুল আহসান (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি), জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি; সদস্য, বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি, রেশম বিশেষজ্ঞ, রেশম প্রজনন ও জীনতত্ত্ব।

মো. মনিরুজ্জামান সরকার (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি), ভিজিটিং ফেলো (রিউকুস, জাপান), সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি; বাস্তুতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব ও ম্যালাকোলজি।

মো. আনিছুর রহমান (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), পি-এইচ. ডি (গিফু, জাপান), জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি।

সাবিনা সুলতানা (২০০৬-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি); ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট, এ্যাকুয়াকালচার, ফিশ মার্কেটিং, জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অধ্যয়ন এবং ফিশ লিমনোলজি।

শাহ্‌ হোসাইন আহমদ মেহ্‌দী (২০০৬-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), পি-এইচ. ডি (রিউকুস, জাপান), পোস্ট-ডক্টোরাল ভিজিট (পিকিং, চীন); মেরুদন্ডি প্রাণীর গঠন ও কার্যকারীতা ও ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ক্রপ প্রোটেকশন ও টক্সিকোলজি, খামার ও গবেষণাগার প্রাণী, প্রজাপতির মলিকিউলার ফিজিওলজি ও বিবর্তন, ক্যান্সার কোষ।

মো. আরিফুল হাসান (২০০৬-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি); মেরুদন্ডি প্রাণী, প্রাণীভূগোল ও অভিযোজন বাস্তুবিদ্যা, সেরিকালচার, রেশম ও তুঁত গাছের ব্যাধি এবং আপদ অধ্যয়ন।

সারমিন আক্তার (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি); ফিশ টেকনোলজি, ফিশারিজ বায়োলজি, রিসোর্স ও লিমনোলজি।

সহযোগী প্রফেসরবৃন্দ

মো. ফজলুল হক (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, এম. ফিল (রাবি), পি-এইচ. ডি (মাহিদল, থাইল্যান্ড), সদস্য, আমেরিকান সোসাইটি ফর মাইক্রোবায়োলজি, বাংলাদেশ; জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি।

শারমিন মুস্তারী (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি); জীবন সদস্য, বাংলাদেশ জেনেটিক্যাল সোসাইটি ও বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি; জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি।

মনিকৃষ্ণ মহন্ত (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রাবি); সদস্য, বাংলাদেশ জেনেটিক্যাল সোসাইটি; জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি, এনভাইরনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি ও টক্সিকোলজি।

ইশতিয়াক মাহ্‌ফুজ (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি), এম. এস (স্কভদে, সুইডেন), পি-এইচ. ডি (মোনাশ, অস্ট্রেলিয়া); ক্রপ প্রোটেকশন, মলিকিউলার বায়োলজি।

সহকারী প্রফেসর

মেহেরুন নেসা (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রাবি); ক্রপ প্রোটেকশন ও টক্সিকোলজি।

খন্ডকালীন শিক্ষক

প্রফেসর মো. সোহরাব আলী (২০১৭-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (ঢাবি), এম. ফিল (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাবি (১৯৮৮-৮৯); পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, রাবি (২০০০-০৩); সিনেটর, রাবি (২০০০-০৪); সিন্ডিকেট সদস্য, রাবি (২০০৩-০৪); ডীন, কৃষি অনুষদ, রাবি; প্রেসিডেন্ট, রাবি শিক্ষক সমিতি; অমেরুদন্ডি প্রাণী, কীটতত্ত্ব; নেমাটোলজি ও ভার্মিকালচার।

প্রেষণে অবস্থানরত শিক্ষক

প্রফেসর আনন্দ কুমার সাহা (২০১৭-): উপ-উপাচার্য, রাবি (প্রেষণে); বি.এস-সি (সম্মান), এম.এস-সি (রাবি), এম.এস-সি (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পি-এইচ. ডি (পুনে, ভারত), সিনেটর, রাবি (২০০৪-০৮); প্রেসিডেন্ট, রাবি শিক্ষক সমিতি; ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন; কোষতত্ত্ব, বায়োটেকনোলজি ও কৃষি মাইক্রোবায়োলজি।

দ্রষ্টব্য: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০-এর জন্য সরবরাহকৃত তথ্য। প্রতিবেদনের সময়কাল: ১-৭-২০১৯ থেকে ৩০-৬-২০২০।

তথ্যাদি সংগ্রহ ও সন্নিবেশনে: প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম; সহযোগিতায় প্রফেসর ড. কামরুল আহসান।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ৬২০৫।
টেলিফোন: (০৭২১) ৭১১১১৯
ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
ই-মেইল : zoology@ru.ac.bd
Website : http://www.ru.ac.bd/zoology/

কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

কর্মকর্তাবৃন্দ

ড. আনজুমান আরা আলী (২০০৬-) : ডেপুটি কিউরেটর; বিভাগীয় মিউজিয়ামের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত।
মো. রেজাউল করিম (১৯৮৪-) : ডেপুটি রেজিস্ট্রার; বিভাগীয় স্টোর ও ক্রয়-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মোছা. চামেলী খাতুন (২০১১-) : ডেপুটি রেজিস্ট্রার; বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. কাওসার আলী (১৯৯০-) : ডেপুটি রেজিস্ট্রার; অফিসের যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
আইরিন নাহার (২০০৪-) : সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর; অফিসের টাইপিং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. আব্দুল ওয়াহাব (২০০৪-) : সেকশন অফিসার; ভর্তি, উপবৃত্তি ও ফলাফল রক্ষণাবেক্ষণ;
মো. মনোয়ার হোসেন (২০০৪-) : সেকশন অফিসার; নমুনা সংগ্রহসহ প্রশাসনিক সহযোগিতা;

সহায়ক কর্মচারীবৃন্দ

মো. গোলাম মোস্তফা (১৯৯৪-) : সিনিয়র সহকারী; কম্পিউটার ল্যাব ও পারিশ্রমিক বিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. নূরুল ইসলাম (১৯৮৬-) : আর্দালী পিওন; সভাপতি ও অফিসের সার্বিক সহযোগিতা।

সাধারণ কর্মচারীবৃন্দ

মো. কেতাব আলী (২০০৪-) : মিউজিয়াম পরিচারক; বিভাগীয় মিউজিয়াম রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা।
মো. আতিকুর রহমান (২০০৪-) : গবেষণাগার পরিচারক; ক্রপ প্রটেকশন ল্যাবের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. নাসিরুল ইসলাম (২০০৪-) : গবেষণাগার পরিচারক; ইকোলজি ল্যাবের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. মাসুদুর রহমান (২০০৪-) : অ্যানিমাল বেয়ারার; সেরিকালচার ল্যাবের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. আলিউল হক (নয়ন) (২০০৪-) : অফিস সহায়ক; সভাপতি ও অফিসের সার্বিক সহযোগিতা।
মো. টিপু সুলতান (২০০৪-) : গবেষণাগার পরিচারক; জেনেটিক্স ল্যাবের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. শাজাহান আলী (২০০৪-) : গবেষণাগার পরিচারক; বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরীতে সহযোগিতা।
মো. সালাহ্ উদ্দিন মামুন (২০১৭-) : গবেষণাগার পরিচারক; কীটতত্ত্ব ল্যাবের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
সোহেল রানা (২০১৭-) : গবেষণাগার পরিচারক; ফিশারিজ ল্যাবের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. হানিফ শেখ (২০০০-) : প্রহরী; মাঠ গবেষণাগার রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা।
মো. আলমগীর হোসেন (২০০০-) : প্রহরী; মাঠ গবেষণাগার রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা।
মো. ফরিদ উদ্দিন (২০১২-) : প্রহরী; মাঠ গবেষণাগার রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা।
মো. মনিরুল ইসলাম (২০১২-) : মালী; মাঠ গবেষণাগার ও বাগানের সহযোগিতা।
শ্রী রতন লাল (২০০৪-) : সুইপার; বিভাগের যাবতীয় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মো. জুলফিকার আলী ভুট্টো (২০০৪-) : প্রহরী; মাঠ গবেষণাগার রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা।
আনোয়ারা বেগম (২০০৪-) : আয়া; লেডিস কমনরুম ও আপ্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা পরিবারের উপরোক্ত সদস্যবৃন্দ বিভাগের চালিকা শক্তি। বিভাগের প্রশাসনিক, পঠন-পাঠনিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাঁদের প্রত্যেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি
প্রযত্নে ঃ প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫।
টেলিফোন ঃ ০৭২১ ৭১১১১৯; ই-মেইল ঃ zoology@ru.ac.bd
Website: http://www.ru.ac.bd/zoology/

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের কার্যকরী পরিষদ

সভাপতি	:	প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম সেলফোন: ০১৩০৭ ১৪০৬৬৯।
কোষাধ্যক্ষ	:	প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র দাস সেলফোন: ০১৫৫৬ ৩০৮৯৮৭।
সহ-সভাপতি	:	সাজ্জাদুর রহমান (শাওন), এমএস, রোল নং ১৪১১৬৭০১, সেলফোন: ০১৭৩৭ ৩৬১১৯৮।
উপ সহ-সভাপতি	:	মো. আল-আমীন (শামস), ৪র্থ বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৬১০৪৫৯১৬৬, সেলফোন: ০১৭৩৮ ৭১৯০০৩।
সাধারণ সম্পাদক	:	মো. তাহাজ্জত হোসেন (জীবন), ৪র্থ বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৬১০৪৫৯১৭৩, সেলফোন: ০১৭৭৩ ৮৩৩১৩৩।
সহ-সাধারণ সম্পাদক	:	সাহেদুল আলম, ২য় বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৮১০৫৫৯১১৮ সেলফোন: ০১৭৯৬ ৭০৪৬৭১।
বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পাদক	:	মো. ফিরোজ সরকার, ৩য় বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৭১০৩৫৯১০৫ সেলফোন: ০১৭৮২ ৮৬৬২৬০।
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	মো. ফরিদুল আলম, ২য় বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৮১৯৮৫৯১৬০ সেলফোন: ০১৬২১ ৬৮০৩১৩।
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	:	মোছা. জুলিয়া আফরিন (জুলি), ২য় বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৮১২০৫৯১৫৬ সেলফোন: ০১৭৯৯ ১৩১৮৭৩।
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	মো. ছানোয়ার হোসেন, ১ম বর্ষ (সম্মান) রোল নং ১৯১০৫৫৯১৬১ সেলফোন: ০১৭৭৫ ৬৬৪৪১৩।
শ্রেণি প্রতিনিধিবৃন্দ	:	মো. রাশেদুল ইসলাম, এমএস (ইকোলজি), রোল নং ১৪১১৬৬৩৯ সেলফোন: ০১৭৬৩ ১৬৮৩৪৬। মো. আব্দুল হালিম, এমএস (ফিশারিজ), রোল নং ১৪০৮৬৬৩১ সেলফোন: ০১৭৫২ ১২৪৮১১। মো. আব্দুল মোমিন প্রামানিক, এমএস (জেনেটিক্স), রোল নং ১৪০৭৬৬৬৬ সেলফোন: ০১৭২২ ০১৫৬৩০। জাহাঙ্গীর আলম, এমএস (এন্টোমোলজি), রোল নং ১৪০২৬৬১২ সেলফোন: ০১৭২৭ ৮৭৭০৯৪। গোরাচাঁদ গোস্বামী, এমএস (ক্রপ প্রোটেকশন), রোল নং ১৪০৯৬৬৯৯ সেলফোন: ০১৭৩৮ ৬৫২১৩২। মো. ফারুক হোসেন, এমএস (সেরিকালচার), রোল নং ১৪০৯৬৭১৮ সেলফোন: ০১৭২৭ ৯৬১১৬২। জান্নাতুল ফেরদৌস রুমপা, ৪র্থ বর্ষ সম্মান (সম্মান), রোল নং ১৬১২০৫৯১১৮ সেলফোন: ০১৭৮০ ৪৯৫১৫৪। মো. গাজীউর রহমান গালিব, ৩য় বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৭১০৪৫৯১০৬ সেলফোন: ০১৭৯৩ ৯২৫১০১। হাদিউল ইসলাম (মিশুক), ২য় বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১৮১১১৫৯১৩৩ সেলফোন: ০১৭৮৬ ০৬৭৭৪৮। মো. আখতারুজ্জামান রোকন, ১ম বর্ষ (সম্মান), রোল নং ১০১০৭৫৯১৩৭ সেলফোন: ০১৭৯২ ৭১৪৭৯৪।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতির কার্যবিবরণী

মো. তাহাজ্জত হোসেন (জীবন)
সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি।

বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই রাবি প্রাণিবিদ্যা সমিতিকে সংগঠিত এবং এর কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিটি বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ভোটের মাধ্যমে সমিতির ২০১৮-১৯ কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের নির্বাচিত করেন। অতঃপর নব-নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি পরিচিতি ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ও রাবি প্রাণিবিদ্যা সমিতি যৌথভাবে বছরব্যাপী নিচে বর্ণিত কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করে।

১. ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান।
২. ২১শে ফেব্রুয়ারী মহান ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদন।
৩. ৭ই মার্চ বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য দিবস উদ্‌যাপন।
৪. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন।
৫. ১৪ই এপ্রিল, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন।
৬. বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা।
৭. ‘এডিস মশাকে চিনুন এবং এর কামড় থেকে বাঁচুন’ শীর্ষক ডেঙ্গু সচেতনতা র‍্যালি।
৮. প্রাণিবিদ্যা অলিম্পিয়াড ২০১৯-এর আয়োজন (১৫-১১-২০১৯)।
৯. আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন।
১০. বিভাগের ক্রীড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের তত্বাবধানে প্রাণিবিদ্যা আন্তঃবর্ষ ক্রিকেট ও ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন।
১১. বিভাগে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া (২৪-০৯-২০১৯), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক (৩০-০৯-২০১৯) প্রতিযোগিতার আয়োজন।
১২. দেশের বন্যার্তদের ও রাবির অসুস্থ শিক্ষার্থীর জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের ক্যাম্পেইন ও উদ্যোগ গ্রহণ।
১৩. আন্তঃবিভাগ ক্রীড়া যথা: ফুটবল, ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণ।
১৪. এমএস (২০১৮) শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান (২৯-১২-২০১৯)।

রাবি প্রাণিবিদ্যা সমিতির উপরোল্লিখিত কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি শ্রেণীপ্রতিনিধিবৃন্দসহ সকল শিক্ষার্থী, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ও বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ও সমিতির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা সমিতির বছরব্যাপী কার্যক্রমের কয়েকটি ছবি।

প্রাণিবিদ্যায় ১ম বর্ষ বিএস-সি (সম্মান) ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ৪৯তম ব্যাচের নবাগত শিক্ষার্থীদের পরিচিতি

রুনা খাতুন
রোল-৯০০১

জান্নাতুল মাহী
রোল-৯১০৪

মোসাঃ মনিরা পারভিন মিম
রোল-৯১০৫

প্রিয়াঙ্কা দাস
রোল-৯১০৬

নুসরাত জাহান নুসা
রোল-৯১০৭

নাফিসা সিদ্দিকা ডোনা
রোল-৯১০৮

মীর রুম্মান আহমেদ
রোল-৯১০৯

অমৃতা চক্রবর্ত্তী
রোল-৯১১০

সন্ধ্যা
রোল-৯১১১

আলমগীর হোসাইন
রোল-৯১১৩

মাসরুফা
রোল-৯১১৪

আবু সায়েম
রোল-৯১১৬

বিপাশা নাজরিন
রোল-৯১১৯

মোঃ সুমন রানা
রোল-৯১২১

মারুফ ইয়াসমিন
রোল-৯১২৩

মোঃ নাইমুর রহমান
রোল-৯১২৪

তামান্না আফরোজ চার্মিং
রোল-৯১২৫

নিশাত তাসনীম তৃষা
রোল-৯১২৬

মোঃ মিলন ইসলাম
রোল-৯১২৮

মোঃ আতিয়ার রহমান
রোল-৯১২৯

মোঃ ফজলে রাব্বী
রোল-৯১৩১

মোঃ ইকবাল পারভেজ
রোল-৯১৩৩

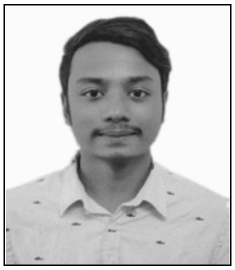
দিপু রায়
রোল-৯১৩৫

মোঃ আক্তারুজ্জামান
রোল-৯১৩৭

সোনিয়া
রোল-৯১৩৮

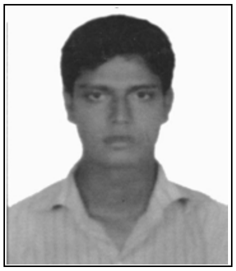
মোঃ তরিকুল ইসলাম
রোল-৯১৪০

নুসরাত জাহান বৃষ্টি
রোল-৯১৪২

ফারহিন তামান্না
রোল-৯১৪৪

নাজনীন আক্তার
রোল-৯১৪৬

কণিকা রহমান
রোল-৯১৪৭

অন্তরা
রোল-৯১৪৯

রায়হান আহমেদ
রোল-৯১৫০

সুমাইয়া ইসলাম তিতলী
রোল-৯১৫৩

সিরাজুম মনিরা
রোল-৯১৫৪

আবুল কালাম
রোল-৯১৫৫

তৈয়বা আক্তার
রোল-৯১৫৬

রোকাইয়া
রোল-৯১৫৮

এস আর মাহিম শেফা
রোল-৯১৫৯

মোঃ সানোয়ার হোসেন
রোল-৯১৬১

সুবর্না খাতুন
রোল-৯১৬২

মার্জিনা
রোল-৯১৬৩

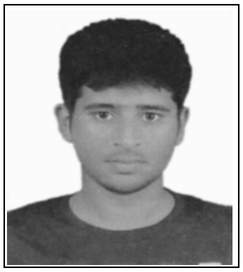
মোঃ খাইরুল আলম
রোল-৯১৬৬

সায়েদা জাসিয়া সুলতানা
রোল-৯১৬৭

সুমি আক্তার
রোল-৯১৭৩

মীম আক্তার
রোল-৯১৭৭

মোঃ আব্দুল খালেক
রোল-৯১৭৮

বিজরী পর্বত উল্লাহ
রোল-৯১৮০

খাইরুল আলম রোকন
রোল-৯১৮১

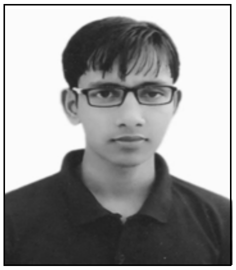
মোঃ শিহাব উদ্দীন
রোল-৯১৮২

মোসাঃ আলপোনা খাতুন
রোল-৯১৮৩

মাহিয়া বিন্‌তে হোসেন
রোল-৯১৮৪

প্রিন্স মালো
রোল-৯১৮৫

ইমামুল হক রানা
রোল-৯১৮৬

ইশরাত জাহান
রোল-৯১৮৮

তাবাসসুম ফেরদৌস
রোল-৯১৮৯

মমি রানী রায়
রোল-৯১৯১

নাজনীন আরা নিশু
রোল-৯১২৭
(পুনঃভর্তি)

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার-রাঙ্গামাটি-বান্দরবান-সেন্ট মার্টিন’স দ্বীপে শিক্ষাসফর যাত্রার পূর্বলগ্নে।

পৃথিবীর কয়েকটি অদ্ভুদ ও দূষ্প্রাপ্য প্রাণী

চিত্র ১: আয়ি-আয়ি

চিত্র ২: আর্মাডিলো গার্ডল্ড্ টিকটিকি

চিত্র ৩: কেশরযুক্ত নেকড়ে

চিত্র ৪: ফোসা

চিত্র ৫: ফ্রিগেট পাখি

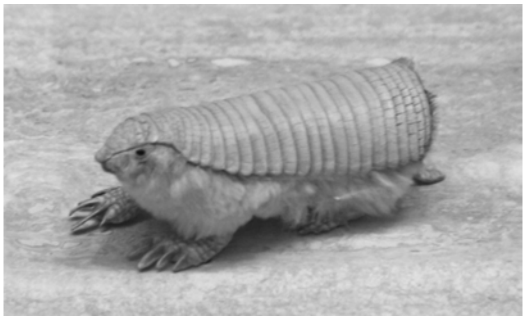

চিত্র ৬: গোলাপী সুন্দরী আর্মাডিলো

চিত্র ১। আয়ি-আয়ি (Aye-aye): মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জ এমন একটি জায়গা যেখানে অদ্ভুদ অনেক প্রাণী পাওয়া যায়, যেগুলো পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এমনি একটি প্রাণী হচ্ছে আয়ি-আয়ি, যার বড় বড় চক্ষুযুগল যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে, এর দন্তরাশি সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর হাতে রয়েছে লম্বা লম্বা আঙ্গুল। এরা এক ধরনের লেমুর (lemur), যারা জঙ্গলে রাতে খাবারের খোঁজে বের হয়। প্রাণীটি দেখতে সত্যি ভীতিকর, বিশেষ করে যদি কেউ এই প্রাণীটির সঙ্গে জঙ্গলে হঠাৎ করে মুখোমুখি সাক্ষাৎ পেয়ে যায়। **চিত্র ২**। আর্মাডিলো গার্ডল্ড্ টিকটিকি (Armadillo girdled lizard): দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশের এন্ডেমিক প্রাণী এরা। এদের চেহারা দেখতে ছোট ড্রাগনের মতো। প্রাণীটি শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে নিজেকে দ্রুত সুন্দরভাবে গুটিয়ে গোল আকৃতি ধারণ করতে পারে। বাচ্চা প্রসব করার কারণে এরা অদ্ভুদ, যা খুব কমসংখ্যক সরীসৃপে দেখা মেলে। তাছাড়া জন্মের পর স্ত্রী টিকটিকিকে তাদের বাচ্চাদের খাওয়াতে দেখতে পাওয়ার বিবরণ রয়েছে। **চিত্র ৩**। কেশরযুক্ত নেকড়ে (Maned wolf): আসলে নেকড়ে নয়, কিন্তু নেকড়ে, শিয়াল ও কুকুরের কাছাকাছি জ্ঞাতিভাই এই প্রাণীটি লম্বা কান ও লম্বা পা-বিশিষ্ট একটি চমৎকার সুন্দরদেহী স্তন্যপায়ী। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, পেরু ও প্যারাগুয়ে অঞ্চলের সর্বভূক এই প্রাণীটি দলবদ্ধ না হয়ে একাকী বাস করে, যেটি প্রাণীটির আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। **চিত্র ৪**। ফোসা (Fossa): বিড়ালসদৃশ প্রায় ৪ ফুট লম্বা এই প্রাণীটি মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জের আরেকটি অদ্ভুত স্তন্যপায়ী। এদের লম্বা শরীর, খাটো পদযুগল এবং ছোট ও গোল কান রয়েছে। এরা আমাদের পরিচিত বেজী বা মঙ্গুজ-এর নিকটাত্মীয়, যদিও দেখতে এরা কাউগার (cougar) মতো। ফোসা মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জের একমাত্র মাংসাশী, যেটি বাচ্চা বা পুর্ণবয়স্ক লেমুর (lemur) খেয়ে থাকে। **চিত্র ৫**। ফ্রিগেট পাখি (frigate bird): শুধুমাত্র গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী অত্যন্ত সুদৃশ্য এই পাখিটির দুই ডানার বিস্তৃতি প্রায় আড়াই মিটার এবং এরা সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ২,৫০০ মিটার উপর পর্যন্ত উড়তে সক্ষম। পাখিটি 'যুদ্ধ মানব' ('man-o'-war' bird) নামেও পরিচিত, কারণ এটি উড়ন্ত অবস্থায় অন্যান্য পাখিকে আক্রমণ করে কখনো কখনো তাদের পর্যন্ত খাবার কেড়ে নিতে পারে। আরেকটি অত্যন্ত মজার ব্যাপার হলো এদের পুরুষ পাখির বুকে একটি বিরাট লাল থলে রয়েছে, যা তারা ফুলিয়ে মেয়ে সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার কাজে ব্যবহার করে থাকে। **চিত্র ৬**। গোলাপী সুন্দরী আর্মাডিলো (Pink fairy armadillo): মধ্য আর্জেন্টিনার এই সুন্দর ও অদ্ভুদ প্রাণীটি প্রকৃতিতে এতই দুষ্প্রাপ্য যে, বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এদের প্রকৃত কনজারভেশন স্টাটাস (conservation status) নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এরা খুবই ছোট, মানুষের হাতের মুঠোয় এরা অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। ছোট্ট আর্মাডিলোটি নিশাচর এবং মাটির গর্তে বাস করে। লাজুক এই প্রাণীটির দেখা পাওয়া তাই নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার।

তথ্যসূত্র: https://www.rainbowtours.co.uk/blog/10-strange-animals-and-where-to-go-to-see-them/